বিবেকানন্দ
কথামৃত

বিবেকানন্দ কথামৃত

স্বামী স্বরূপানন্দ

সোমা প্রকাশন
৬, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা—৭০০০০৯

প্রকাশক :
সোমা প্রকাশনের পক্ষে
শ্রীশুভময় বন্দ্যোপাধ্যায়
কলিকাতা—৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশক : জন্মাষ্টমী, ১৩৯৫

মূল্য : ১০ টাকা

মুদ্রক :
শ্রীপ্রণবেশ কুমার জানা
৩০, কলেজ রো
কলিকাতা—৭০০০০৯

সূচীপত্র

বিবেকানন্দের গল্প

বিজ্ঞানী বলেন, পৃথিবীতে যে জিনিসের অস্তিত্ব আছে, সেই জিনিসেরই একটা ওজন আছে। কারণ বস্তু যতই ছোট হোক, তার একটা ভর আছে এবং বিজ্ঞানের ভাষায় ভর ও অভিকর্ষজ বলের গুণফলই হল ওজন। তাই পৃথিবীতে অস্তিত্বশীল প্রতিটি জিনিসকেই মাপা যায়। বিজ্ঞান তাকে মাপতে পারে।

কিন্তু, সত্যিই কি তাই ?

সততা, নিষ্ঠা প্রভৃতি গুণের অস্তিত্ব আছে, কিন্তু তাকে মাপার যন্ত্র কই ? মহামানবের বিরাটত্বকে অনুভব করতে পারি, কিন্তু তাকে মাপব কি করে ? পৃথিবীর সব মাপনী, সব মাপনযন্ত্র তার কাছে ব্যর্থ।

আমাদের আলোচ্য স্বামী বিবেকানন্দ ব্যক্তিটিও তাই। আমরা বলি তিনি বিরাট, তিনি মহান ; কিন্তু তাঁর বিরাটত্ব বা মহত্ত্ব কতটা, সে সম্বন্ধে আমাদের কোন ধারণাই নেই। সাগরের অসীম জলরাশির পাশে সিমেন্ট বাঁধানো জায়গায় ধরে রাখা জলের মত কিংবা বিরাট দীঘির জলের পাশে একবিন্দু শিশিরের মতই এক বিরাট মানুষের বিরাটত্বের মহিমা বোঝার সাধ্য আমাদের অনেকেরই থাকে না।

প্রতিটি রচনাতেই সূচনা এবং উপসংহার লিখতে হয়। প্রতিটি জিনিসেরই আরম্ভ এবং শেষ আছে—এটা প্রকৃতিরই নিয়ম। কিন্তু বিবেকানন্দ ামক মানুষটির জীবন বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখি, রচনা বা প্রকৃতির নিয়ম তাঁর ক্ষেত্রে খাটে না। বিবেকানন্দের সূচনা আছে, কিন্তু উপসংহার বা শেষ নেই। এক বিরাট কর্মকাণ্ড, এক মহাযজ্ঞের তিনি হোতা। তাঁর মৃত্যুর পর ৮৬ বছর পার হয়ে গিয়েছে, কিন্তু যে কর্মকাণ্ড তিনি শুরু করে গিয়েছিলেন এখনও তা করা হয় নি এবং এখনও আমরা বুঝি, ভারতবাসীর সার্বিক কল্যাণ, ভারতের চরম ও পরম উন্নতি একমাত্র তাঁর নির্দেশিত পথেই লাভ করা সম্ভব। তাঁর আরব্ধ কাজ শেষ করার মত মানুষ এখনও ভারতবর্ষে জন্মে নি।

আশ্চর্যের কথা, মানুষটি কিন্তু প্রথম দিকে চেয়েছিলেন তাঁর নিজের মুক্তি। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হল, তখন তিনি এক বিপর্যস্ত মানুষ। একদিকে তাঁর বাবার মৃত্যু হয়েছে (২১ ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৪), অন্যদিকে তাঁর আত্মীয়স্বজনরা তাঁদের সম্পত্তি দখলের জন্য মিথ্যা মামলা শুরু করেছে। পিতার অর্থসঞ্চয় ছিল না, মা-ভাই-বোনদের নিয়ে তরুণ বিবেকানন্দ তাই অর্থকষ্টে রীতিমত বিব্রত। রামকৃষ্ণদেবকে তিনি তাই একদিন সরাসরি বললেন, 'ঠাকুর, আপনি তো ঈশ্বরকে দেখেছেন। তাঁকে বলুন না, আমাকে কিছু অর্থ দিতে।'

ঠিক মানুষের কাছেই অর্থের কথা বলেছিলেন বিবেকানন্দ। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর কথা শুনে হাসলেন। মানুষের দুর্দশামোচন যাঁর ভবিষ্যৎ লক্ষ্য, তিনি কিনা নিজের দুর্দশা থেকে মুক্তি চাইছেন! রামকৃষ্ণদেব কিন্তু তাঁকে এসব কথা বললেন না, বরং তাঁকে দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দিরে গিয়ে অর্থের জন্য প্রার্থনা জানাতে বললেন। তিনবার মা কালীর মন্দিরে ঢুকলেন নরেন্দ্রনাথ, কিন্তু কিছুতেই ঈশ্বরের কাছে অর্থ চাইতে পারলেন না, পরিবর্তে চাইলেন জ্ঞান, বিবেক ও বৈরাগ্য। এই ঘটনা ১৮৮৪ সালের। আর এই ঘটনার দু বছর পর, ১৮৮৬ সালের মার্চ মাসে নরেন্দ্রনাথ নির্বিকল্প সমাধি লাভ করেন।

এর পর থেকে নরেন্দ্রনাথ আত্মমগ্ন। ছেলেবেলায় ধ্যান-ধ্যান খেলতে তিনি ভালবাসতেন। নির্বিকল্প সমাধি লাভের পর ধ্যানই হল তাঁর একমাত্র লক্ষ্য। ধ্যানের মাধ্যমে তিনি চাইলেন নিজের মুক্তি। কিন্তু বাদ সাধলেন গুরু রামকৃষ্ণদেব। প্রিয় শিষ্যকে তিনি ধমকই দিলেন: মুক্তি? কেন, কিসের তাড়নায়? ভারতের কোটি কোটি মানুষ যেখানে দুর্দশাগ্রস্ত, সেখানে একজনের মুক্তি দিয়ে কি হবে? জীবই শিব। কোটি কোটি জীবের আর্তনাদ যেখানে আকাশ-বাতাস মুখরিত করছে, সেখানে শিব স্থির থাকবেন কি করে? নরেন্দ্রর দিকে তাকিয়ে বললেন রামকৃষ্ণ: তুই আর পাঁচজনের মত নিজের কথা ভাববি, এত ছোট মনের লোক তুই নোস্। সবার জন্য তোকে ভাবতে

হবে। সকলের ভার বইতে হবে তোকে, হতে হবে বট গাছের মত। নিজের নয়, জগতের মুক্তির জন্য তোকে চেষ্টা করতে হবে। দুর্দশাগ্রস্ত মানুষ তোর ছায়ায় বিশ্রাম নিয়ে শান্তি পাবে।

গুরুর কথা খুব সহজে মেনে নেন নি নরেন্দ্রনাথ। দর্শনের পাশাপাশি ফলিত গণিত পড়েছিলেন তিনি, যুক্তিবাদী মন—এক কথায় নতশির হওয়া তাঁর স্বভাব ছিল না। কিন্তু রামকৃষ্ণদেবও একগুঁয়ে, শিষ্যকে তিনি স্পষ্ট বললেন : 'তোর হাড় করবে।'

বস্তুত যে বিবেকানন্দকে আমরা দেখেছি, তাঁর যে বিরাটত্বের কথা পড়ে আমরা মুগ্ধ হই, তার বীজ বপন করে দিয়ে গিয়েছিলেন রামকৃষ্ণদেবই। তিনিই নরেন্দ্রনাথকে বুঝিয়েছিলেন শিবজ্ঞানে জীবের সেবাই প্রকৃত ঈশ্বর লাভ, প্রকৃত মুক্তি। শুধু এই একটি কথাই নরেন্দ্রনাথের জীবনদর্শন পালটে দিয়েছিল। নিজের মুক্তির জন্য আর তিনি লালায়িত হয় নি, পরিবর্তে কোটি কোটি লাঞ্ছিত-দরিদ্র-নিপীড়িত ভারতবাসীকে সচেতন করাই হয়ে দাঁড়িয়েছিল তাঁর লক্ষ্য।

নরেন্দ্রনাথের জীবনের লক্ষ্য নির্দিষ্ট করে দিয়ে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব মহাসমাধি লাভ করলেন। নরেন্দ্রনাথের মনে তখন আর কোন সংশয় ছিল না, মহৎ গুরুর কৃপায় নতুন জীবনের আলোকে তাঁর মন তখন উদ্ভাসিত। বরানগরে একটি পুরনো ভাঙ্গা বাড়িতে তিনি 'শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ' প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর ১৮৮৭ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে তিনি সন্ন্যাস নিলেন, তাঁর নাম হয় 'স্বামী বিবিদিষানন্দ।'

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের সেই কাগজে লিখে দেওয়া কথা 'নরেন শিক্ষে দিবে' কিন্তু ভোলেন নি নরেন্দ্রনাথ। শিক্ষা দিতে হলে প্রথমে নিজেকে জানতে হয়। সন্ন্যাস নেবার পর (১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দে) নরেন্দ্রনাথ তাই পরিব্রাজক হিসেবে বেরিয়ে পড়লেন বরানগর মঠ থেকে। লক্ষ্য, ভারতবর্ষকে জানা—ধ্যানগম্ভীর ভারতীয় ভূভাগের নদী-জপমালাধৃত প্রান্তরকে জানা, ভারতের জল-মাটি-হাওয়ার সঙ্গে পরিচিত হওয়া,

অজস্র জাতি-ধর্ম-সংস্কৃতিসম্পন্ন এই মহান দেশের মানুষের প্রকৃত রূপটিকে জানা।

১৮৮৮ থেকে ১৮৯০ খ্রীস্টাব্দ—এই তিন বছর আমরা দেখি পরিব্রাজক নরেন্দ্রনাথকে। উত্তর ভারতের কাশী-অযোধ্যা-লক্ষ্ণৌ-আগ্রা-বৃন্দাবন-হৃষীকেশ-বৈদ্যনাথ-এলাহাবাদ-নৈনিতাল-আলমোড়া-দিল্লি থেকে শুরু করে গোটা পশ্চিম ভারত ও দক্ষিণ ভারত ঘুরে বেড়ালেন তিনি। এই ভ্রমণের প্রত্যক্ষ ফল হিসেবে একদিকে যেমন তিনি ঐতিহ্যময় ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হলেন, অন্যদিকে দেশের রাজা থেকে শুরু করে সমাজের অবহেলিত দরিদ্র মানুষের সংস্পর্শে এলেন। অগণিত মানুষ তাঁর গভীর জ্ঞান, অদ্ভুত বাচনভঙ্গি ও স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হল। কিন্তু চিরকালই তিনি ছিলেন প্রচারবিমুখ, সন্ন্যাস নেবার পর থেকে নিঃসঙ্গ একক জীবন কাটানোই ছিল তাঁর ইচ্ছা। নেতৃত্বদানের উপযোগী প্রতিভা এবং ব্যক্তিত্ব থাকলেও নেতা হতে তিনি চান নি কখনই। বরং সব সময়েই ছদ্মনামের আড়ালে নিজের প্রকৃত পরিচয় গোপন রাখতেই আগ্রহী ছিলেন। তাই দিল্লিতে 'বিবিদিষানন্দ', পশ্চিম ভারতে 'বিবেকানন্দ' এবং দক্ষিণ ভারতে 'সচ্চিদানন্দ' নামটি তিনি ব্যবহার করেছিলেন।

নামে কি আসে যায়, আসল কাজ তো আলোর দিশা খুঁজে পাওয়া। পরাধীনতার শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত ভারতের চারদিকে ঘোর অমানিশার অন্ধকার—একটা মহান জাতি বিদেশী শাসকের চক্রান্তে নিজেদের উন্নত সুমহান সংস্কৃতিকে ভুলেছে, বিদেশের পুতুলকে দেবতা বলে মাথায় তুলে পুজো করছে, দেশের মানুষদের একটা বিরাট অংশকে সমাজের উচ্চ বর্ণের মানুষরা অস্পৃশ্য-অন্ত্যজ বলে দূরে সরিয়ে রেখেছে—গোটা দেশ এক অচিন্ত্যনীয় বিপর্যয়ের সম্মুখীন। পরিব্রাজক হিসেবে ঘুরতে ঘুরতে দেশ ও জাতির এই পর্বতপ্রমাণ ত্রুটি নরেন্দ্রনাথের নজরে পড়ল, অন্ধকারের মূল কারণটি তাঁর বোধগম্য হল। বিদ্যুৎ-ঝলকে আকস্মিক উদ্ভাসিত পথের মত তিনি নিজের পথের সঠিক

নিশানা খুঁজে পেলেন। বুঝলেন, অন্ধকার দূর করতে হলে শুধু 'অন্ধকার' 'অন্ধকার' বলে চিৎকার করলেই হবে না, প্রদীপ নিয়ে আসতে হবে। দেশ ও জাতির সামনে জ্ঞানের প্রকৃত প্রদীপটিকেই ধরার সিদ্ধান্ত নিলেন নরেন্দ্রনাথ। এদিক দিয়ে তাঁর 'বিবেকানন্দ' নামটি সঠিক—ঘোর তিমিরাচ্ছন্ন জাতির মোহান্ধকার দূর করার আত্যন্তিক ইচ্ছায় তাঁর বিবেক আলোকিত হল, দেশবাসীর মোহনিদ্রা দূর করার সুকঠিন ব্রত তিনি গ্রহণ করলেন।

কিন্তু ইচ্ছাকে কার্যে পরিণত করার পথে আরও জ্ঞান লাভের প্রয়োজন ছিল। দেশের তথাকথিত শিক্ষিত সমাজ তখন তাকিয়ে আছে বিদেশের দিকে, সাহেবের দেওয়া নিকৃষ্ট খেতাবও এদেশের শ্রেষ্ঠ সম্মানের চেয়ে আদরণীয় বলে গণ্য হচ্ছে—এই মোহাচ্ছন্ন দেশবাসীর চৈতন্য জাগাতে হলে প্রথমে বিদেশেই প্রমাণ করতে হবে নিজের দেশ, ধর্ম ও সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠত্বকে। সেই সঙ্গে ব্যাপকভাবে বিদেশ ঘুরে দেখতে হবে ওদের সঙ্গে আমাদের তফাৎ কোথায়, ওরা কোন্ কোন্ গুণের অধিকারী হয়ে আমাদের দেশের শাসকে পরিণত হয়েছে। দেশবাসীকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে হবে, আমরা বিদেশীদের চেয়ে কোন অংশে কম নই, আমাদের নিজেদের অজ্ঞতা এবং দেশ সম্বন্ধে অনীহাই আমাদের সর্বনাশ সাধন করছে।

বস্তুত, ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে বিবেকানন্দের চিকাগো ধর্ম-মহাসভায় যোগদানের পিছনে এই উদ্দেশ্যগুলি ব্যাপকভাবে কাজ করেছিল। তাঁর বিদেশ যাবার কথা উঠেছিল অনেক আগেই। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব তো অনেক আগেই তাঁকে বলে গিয়েছিলেন, নিজের বিশেষ আধ্যাত্মিক শক্তি দিয়ে তিনি জগতের কল্যাণসাধন করতে সমর্থ হবেন। গাজিপুরের জেলা জজ মিঃ পেনিংটন ঐ একই উদ্দেশ্যে তাঁকে ইংল্যাণ্ডে যেতে বলেছিলেন। কিন্তু স্বামীজী তখন এ নিয়ে মাথা ঘামান নি। পরিব্রাজক রূপে গোটা ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করে নিজের দেশ-জাতি-ধর্মকে

প্রত্যক্ষভাবে অনুধাবনের পরেই মাদ্রাজের জনগণের ঐকান্তিক আগ্রহে তিনি আমেরিকা গমনের সিদ্ধান্ত নেন।

প্রাপ্ত সুযোগের চমৎকার সদ্ব্যবহার করেছিলেন বিবেকানন্দ। বস্তুতান্ত্রিক পাশ্চাত্য জগৎ এই প্রথম সচকিত হয়ে উঠেছিল কোন ভারতবাসীর কথা শুনে। পাশ্চাত্য দেখেছিল, পরাধীন দেশের প্রতিনিধি হয়েও কত উচ্চ শির তিনি, নিজের দেশের সভ্যতা-সংস্কৃতি সম্বন্ধে কত গর্বিত। সুবিশাল ব্যক্তিত্ব নিয়ে দৃপ্ত ভঙ্গিতে ঐ বিরাট ধর্মমহাসভায় হিন্দুধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করলেন আদি ও সনাতন ধর্ম হিসেবে। গর্বিত পাশ্চাত্য জগৎকে জানালেন, পৃথিবীর যাবতীয় ধর্মের মূল কথাকে তাদের জন্মের আগেই হিন্দুধর্ম ব্যক্ত করেছে, অথচ মানুষে-মানুষে বিভেদ স্বীকার করে নি, সকলকেই অমৃতের পুত্র হিসেবে গ্রহণ করার সুমহান উদারতা দেখিয়েছে। ভাষণের শেষ অংশে আরও তেজোদৃপ্ত ভঙ্গিতে পাশ্চাত্যকে তিনি জানিয়ে দিলেন, 'আমি খ্রীস্টকে গ্রহণে সর্বদাই প্রস্তুত, কিন্তু তোমাদেরও উচিত কৃষ্ণ ও বুদ্ধকে গ্রহণ করা।' চিকাগোর ধর্মমহাসভায় বিবেকানন্দের দশটি বক্তৃতা গোটা পাশ্চাত্য জগৎকে নাড়িয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। নির্দ্বিধায় পাশ্চাত্য বীর সন্ন্যাসীর অগাধ জ্ঞানকে স্বীকার করে নিয়ে বলেছিল—'আমাদের সকলের পাণ্ডিত্য জড়ো করলে যা হবে, তার চেয়েও এঁর পাণ্ডিত্য বেশি।'

বিদেশে স্বামীজীর এই বিস্ফোরণের ঢেউ স্বদেশে এসে পৌছতে দেরি হল না। সারা দেশ তখন উত্তেজনায় কাঁপছে। কলম্বো, মাদ্রাজ থেকে ভারতের হৃৎকেন্দ্র কলকাতা পর্যন্ত সর্বত্র উষ্ণ অভ্যর্থনা, আর বিবেকানন্দকে নিয়ে নতুন প্রাণের স্পন্দন। ভারতবাসীর মোহঘোর কাটানোর এই তো উপযুক্ত সময়—'উত্তিষ্ঠত! জাগ্রত'!—ওঠো! জাগো! ভুলিও না—নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই। ভুলিও না—তোমার নারীজাতির আদর্শ সাবিত্রী, দময়ন্তী। ভুলিও না—তোমার উপাস্য উমানাথ সর্বত্যাগী

শঙ্কর; ভুলিও না—তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন ইন্দ্রিয়সুখের—নিজের ব্যক্তিগত সুখের—জন্য নহে; ভুলিও না—তুমি জন্ম হইতেই 'মায়ের' জন্য বলিপ্রদত্ত।' অর্থাৎ, যুগযুগান্ত ধরে ভারত যা বিশ্বাস করে এসেছে, বিবেকানন্দ নতুন করে তা দেখিয়ে দিলেন। দেখালেন, ভারতবর্ষের অবনতির মূল কারণ দেশের তথাকথিত নীচ জাতির মানুষদের প্রতি অবহেলা, জাতির মধ্যে শিক্ষা ছড়িয়ে দেবার অভাব এবং নারীশক্তিকে অবহেলা। এই ত্রুটিগুলির সংশোধন যতদিন না হবে, জাতি ততদিন মোহনিদ্রায় আচ্ছন্ন থাকবে এবং পরাধীনতার নাগপাশ ছিন্ন করাও তার পক্ষে সম্ভব হবে না।

রামমোহনের পরে বিবেকানন্দই প্রথম ব্যক্তি যিনি ব্যাপকভাবে জাতির উন্নতির কথা চিন্তা করেছিলেন। তমসাচ্ছন্ন জাতির মোহঘোর ভাঙ্গিয়ে দিয়ে তিনিই প্রথম দেশবাসীকে স্বাধীনতা-সচেতন করে তুলেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর মাত্র তিন বছরের মধ্যে ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে বাংলায় বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন শুরু হয়। স্বাধীনতা বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের অঙ্কুর এই আন্দোলন—এই আন্দোলন সারা দেশে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে এদেশ থেকে ইংরেজদের উৎখাতের ভিত তৈরি করেছিল। এই আন্দোলনের মাধ্যমেই বাংলায় জন্ম নিয়েছিল বিপ্লববাদ —যার হোতা স্বামীজীর মন্ত্রশিষ্যা ভগিনী নিবেদিতা এবং ঋষি অরবিন্দ। বিপ্লবীদের কাছে চিরকালই বিবেকানন্দ ছিলেন পরম পূজ্য। তাঁরা নিজেরাই স্বীকার করে গিয়েছিলেন, দেশমাতৃকার জন্য আত্মবলি দেবার প্রেরণা তাঁরা লাভ করেছিলেন বিবেকান্দের অমর বাণীগুলি পাঠ করেই।

অসীম দূরদৃষ্টিসম্পন্ন এই মহামানব নিজের জীবনসায়াহ্নে একদিন বলেছিলেন, 'আগামী পঞ্চাশ বছরের মধ্যে ভারত স্বাধীন হবে।' পঞ্চাশ বছর লাগে নি, তাঁর মৃত্যুর মাত্র পঁয়তাল্লিশ বছরের মধ্যে দেশ স্বাধীন হয়েছিল। বিবেকানন্দ বলে গিয়েছিলেন, 'যেভাবে সাধারণত দেশ স্বাধীন হয়, সেভাবে ভারত স্বাধীন হবে না।' এই ভবিষ্যদ্বাণীও সত্যি

হয়েছিল, এত বড় দেশের স্বাধীনতা রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে আসে নি, এসেছিল অনেক দ্রুত এবং বিনা রক্তক্ষয়ে।

বিবেকানন্দকে তবে কি বলব? সাধক—যিনি সাধনার প্রভাবে দূর ভবিষ্যৎকেও অনায়াসে দেখতে পান? আমার ধারণা, শুধু 'সাধক' বললে বিবেকানন্দকে ছোট করা হয়। তিনি সাধকের গুণাবলী আয়ত্ত করেও ছিলেন যে কোন দক্ষ রাজনীতিকের চেয়েও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাজনীতিক। চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী ঠিকই বলেছেন—'আমরা অন্ধ ছিলাম, তিনি আমাদের দৃষ্টি দিয়েছেন। বিবেকানন্দই ভারতীয় স্বাধীনতার জনক—আমাদের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার তিনি পিতা।'

দেশ স্বাধীন হবার পরেও ৪১ বছর পার হয়ে গেল। ভারতের স্বাধীনতা প্রৌঢ়ত্বের পথে পা বাড়াতে চলেছে। কিন্তু এখনও আমরা দেখছি, বিবেকানন্দের স্বপ্ন অপূর্ণই রয়ে গেছে। যে শ্রমজীবীদের কথা ভেবে তিনি বারবার তাঁদের প্রণাম করতে চেয়েছিলেন, তাঁরা অবহেলিত রয়ে গেছেন। জনসমষ্টির বিরাট অংশই দারিদ্র্য ও শোষণের বেড়াজালে পড়ে মূক, হতাশ্বাস ও ক্লিষ্ট। সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ দেখিয়ে দেবে, ভারতের সার্বিক উন্নতির জন্য আজ বিবেকানন্দেরই আদর্শ অনুসরণ করা প্রয়োজন—একমাত্র তাঁর প্রদর্শিত পথেই ভারতবর্ষের পুনরুত্থান ঘটতে পারে। বিবেকানন্দের তাই মৃত্যু নেই, উপসংহার নেই—চিরকাল তিনি আমাদের কাছে আশার আলোকবর্তিকা হয়ে থাকবেন।

বিবেকানন্দের বলা গল্প

শঠে শাঠ্যং

[বন্ধু হল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ আপন জন। অনেক পুণ্যফলে একজন প্রকৃত বন্ধু পাওয়া যায়। সেই বন্ধুর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করলে শাস্তি পেতেই হবে। এই প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ একটি প্রচলিত কাহিনী শোনালেন।]

দুই বন্ধু। একজন মহাজন, আর একজন সওদাগর। ভারি ভাব দুজনে। যত কাজই থাকুক, সারা দিনে অন্তত একবার দুজনের দেখা হওয়া চাই, প্রাণের কথা বিনিময় হওয়া চাই। নইলে ভাত নাকি হজম হয় না তাদের। এমনই তাদের বন্ধুত্ব। অবশ্য নিন্দুকেরা এই বন্ধুত্ব দেখে বলে, বন্ধুত্ব না ছাই, সেয়ানে-সেয়ানে কোলাকুলি।

তা সেসব কথায় কান দেয় না দুজনের কেউই। দিব্যি চলতে থাকে দুজনের ভাব-ভালবাসা।

সেদিন মহাজন প্রচলিত নিয়ম ভেঙ্গে রাতের বদলে দিনে এসে হাজির। হাতে একটা থলি। সেটা সওদাগর বন্ধুর হাতে দিয়ে বলল—এটা তোমায় রাখতে হবে ভাই।

সওদাগর থলিটা হাতে নিয়ে দেখল, বেশ ভারি। একটু অবাক হয়েই বন্ধুকে জিজ্ঞেস করল—কি আছে এর মধ্যে ?

মহাজন হেসে বলল—যাই থাকুক, তুমি এটা তোমার কাছে রেখে দাও। আমি আজই বিকেলে কয়েক দিনের জন্য ব্যবসার কাজে বিদেশ যাচ্ছি। যতদিন না ফিরে আসছি, ততদিন এটা তোমার কাছেই থাক।

সওদাগর বলল—বেশ তোমার যখন ইচ্ছে, তখন আমার কাছেই থাকুক এটা। তুমি আমার বন্ধু, তোমার ইচ্ছায় আমি বাধা দিতে

পারি না। থলির মধ্যে কি আছে তা জানার আগ্রহও আমার নেই। তুমি নিজেই আমার সিন্দুকটা খুলে থলিটা ওর ভেতরে রেখে দিয়ে যাও।

এই বলে সওদাগর বন্ধুর হাতে নিজের সিন্দুকের চাবিটা দিল। মহাজন তার মধ্যে থলিটা রেখে নিশ্চিন্তে চলে গেল।

এদিকে বন্ধু চলে যাবার একটু পরেই সওদাগরের মনটা উসখুস করতে লাগল। মুখে বলেছিল বটে, থলির মধ্যে কি আছে তা জানার আগ্রহ নেই, মহাজন চলে যাবার পর থেকেই তার মনে হতে লাগল, বন্ধু ঐ থলির মধ্যে নিশ্চয়ই খুব দামী কোন জিনিস রেখে গেছে—একবার খুলে দেখলে দোষ কি। তাই কাজের সব লোকজন চলে যাবার পর রাত্রিতে একা সে সিন্দুকটা খুলে থলিটা বের করল।

থলির বাঁধন খুলে সওদাগরের চক্ষু স্থির। থলে ভর্তি চকচকে মোহর—এত মোহর এক সঙ্গে এর আগে জীবনে দেখে নি সে। নিজেকে আর সামলে রাখতে পারল না সওদাগর। লোভ তাকে পেয়ে বসল। বন্ধুর এই মোহরগুলো নিতেই হবে। তবে, বন্ধুত্ব বড় গাঢ়—সরাসরি চুরি করায় মুসকিল আছে, হাজার হোক, চক্ষুলজ্জা বলে তো একটা কথা আছে। সওদাগর তাই চালাকির আশ্রয় নিল। থলির ভেতর থেকে মোহরগুলো বের করে নিয়ে তার বদলে কতকগুলো খুচরো পয়সা ভরে বেঁধেছেদে সিন্দুকে ভরে রেখে দিল। আর মনে মনে ঠিক করে রাখল, বন্ধু এলে বলবে, সে এই ঘটনার কিছুই জানে না, কারণ সিন্দুকে থলিটা রেখে গিয়েছিল মহাজন নিজেই এবং মহাজন চলে যাবার পর থেকে সে একবারও সিন্দুকে হাত দেয় নি।

দিন দশেক পরে মহাজন ফিরে এল নিজের দেশে। এসেই দেখা করল সওদাগরের সঙ্গে। খুব গল্প হল দুই বন্ধুর মধ্যে। সওদাগর খুব হেসে হেসে গল্প করছিল, কিন্তু কেবলই বিবেক তাকে খোঁচা দিচ্ছিল। মহাজন বন্ধুর সঙ্গে কথা বলতে কেবলই তার মনে হচ্ছিল, এমন সরল বন্ধুর সঙ্গে এভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করাটা ঠিক উচিত হয় নি। কিন্তু

একবার কাজটা যখন করেই ফেলেছে, তখন দোষ স্বীকার করে মোহরগুলো ফিরিয়ে দেবার ইচ্ছে হচ্ছিল না—হাজার হোক মোহর তো! তা আবার অতগুলো!

যাই হোক, এক সময় তাদের গল্প শেষ হল। মহাজন বলল, 'আজ উঠি ভাই। দাও, আমার থলিটা দাও।' সওদাগর বন্ধুর হাতে সিন্দুকের চাবি দিয়ে বলল, 'সিন্দুকের ভেতরে তুমি যেমন ভাবে থলি রেখে গিয়েছিলে, সেভাবেই রয়েছে। আমি ওতে হাতও দিই নি। তুমি নিজেই সিন্দুক থেকে ওটা বের করে নাও।'

সিন্দুক থেকে থলিটা বের করার সময়েই কেমন যেন সন্দেহ হয়েছিল মহাজনের। এরপর থলির বাঁধনটা খুলতেই মহাজনের চোখ কপালে উঠল। থলিভরা মোহরের বদলে কতকগুলো খুচরো পয়সা! মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল সে।

সওদাগর তা দেখে যেন কিছুই জানে না, এমন ভাব করে বলল—কি হল গো বন্ধু? অমন ভাবে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লে যে।

মহাজন আর্তনাদ করে বলল—আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে ভাই। থলিভরা মোহর রেখে গিয়েছিলাম তোমার কাছে, এখন দেখছি একটাও মোহর নেই, ভেতরে রয়েছে কেবল কতকগুলো পয়সা!

সওদাগরের বুকটা একবার কেঁপে উঠল। কিন্তু বাইরে তার বিন্দুমাত্র প্রকাশ না দেখিয়ে বলল—কি বলছ তুমি, এমন কাণ্ড কখনও হয় নাকি? মোহর কখনও পয়সা হয়ে যায়?

বলতে বলতে এমন ভাব দেখাল সওদাগর যেন সে কত আশ্চর্য হয়েছে, আর এই ব্যাপারে তার কিছুই করার নেই।

কিন্তু অপরাধী যতই চেষ্টা করুক না কেন, ধরা পড়লে তার মুখভাবের পরিবর্তন হবেই। সওদাগরেও পরিবর্তন হয়েছিল, আর মহাজনের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তা ধরাও পড়ল। মহাজন এতটুকু রাগ দেখাল না কিংবা একবারের জন্যও বন্ধুকে বুঝতে দিল না, সে সওদাগরের সে সব চালাকি ধরে ফেলেছে। খুব সহজভাবে বন্ধুর হাত

স্বরে বলল—আমি তো মোহর মনে করে থলিতে ওগুলো রেখেছিলুম, কিন্তু এখন দেখছি কোথাও কোন গোলমাল ছিল। তা এ ব্যাপারে তোমার তো কোন হাত নেই, কারণ আমি জানি, আমি চলে যাবার পর তুমি সিন্দুকে হাত দাও নি। যাক, কি আর করা যাবে, আজ চলি ভাই।

এই বলে মহাজন বন্ধুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল। সওদাগর তো হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। বন্ধুর সামনে মিথ্যে কথা বলতে এমনিতেই তার খারাপ লাগছিল, তার ওপর বন্ধু তার চালাকি ধরতে পারে ভেবে আরও বিব্রত বোধ করছিল সে। মহাজন তাকে এই বিব্রত অবস্থা থেকে বাঁচিয়ে চলে যাওয়ায় সে খুব খুশি হল। ভাবল, এ যাত্রা ফাঁড়াটা কাটল।

এই ঘটনার পরে মাসখানেক মহাজন আর বন্ধুর কাছে গেল না। সওদাগর রোজই তার কথা ভাবে, কিন্তু বিবেকের তাড়নায় তার কাছে যেতে পারল না।

মাসখানেক পর মহাজন নিজেই একদিন এসে হাজির। তেমনি হাসিখুশি মুখ। বলল—একটা দরকারী কাজে আবার কিছুদিনের জন্য বাইরে গিয়েছিলাম বন্ধু, তাই আসতে পারি নি। কাল এসেছি। ব্যবসায়ে মোটা লাভ করেছি, বাড়িতে তাই একটা খাওয়াদাওয়ার আয়োজন হয়েছে। তোমার ছেলে তো খেতে খুব ভালবাসে, তুমি আজ বিকেলে ওকে আমার বাড়িতে পাঠিয়ে দিও।

সওদাগর বন্ধুর কথায় আপত্তি করার মত কিছু খুঁজে পেল না। তাই সে নিজেই ছেলেকে মহাজনের বাড়িতে রেখে এল। মহাজনকে বলল, খাওয়া-দাওয়া শেষ হবার পর একটু রাতের দিকে এসে ছেলেকে নিয়ে যাবে।

মহাজন এই সুযোগেরই অপেক্ষায় ছিল। বন্ধু চলে যেতেই সে ছেলেটার পোশাক বদলে তাকে একটা ঘরে লুকিয়ে রাখল। আর

একটা পোষা বাঁদরকে সেই ছেলের পোশাক পরিয়ে নিজের সামনে বসিয়ে রাখল।

একটু রাতের দিকে সওদাগর এসে নিজের ছেলের কথা জিজ্ঞেস করতেই মহাজন মুখখানা হাঁড়ির মত করে বলল—একটা বড় মুসকিলে পড়েছি ভাই। তোমার ছেলেটিকে যখন দিয়ে গেলে তখন দেখলাম দিব্যি নাদুস-নুদুস ফুটফুটে চেহারা— কিন্তু এখন দেখছি, ও যেন কি রকম হয়ে গেছে, ঠিক বাঁদরের মত দেখাচ্ছে ওকে। কি করি বল তো বন্ধু ?

এই বলে মহাজন নিজের পাশে বসিয়ে রাখা পোষা বাঁদরটাকে দেখিয়ে দিল। বাঁদরটার পরণে নিজের ছেলের পোশাক দেখেই সওদাগর বুঝে নিল, বন্ধু তার সঙ্গে চালাকি করছে। মাথা ঠিক রাখতে পারল না সে। চেঁচিয়ে বলল—কি পাগলের মত বকছ তুমি ? মানুষ কখনও বাঁদর হয়ে যায় ?

মহাজন নিরীহ ভালমানুষের মত কাঁচুমাচু মুখ করে বলল—কি জানি ভাই। আজকাল কি যে সব ভূতের কাণ্ড হচ্ছে, বুঝি না। এই দেখ না, তোমার কাছে রেখে আসা আমার সোনার মোহরগুলো কেমন খুচরো পয়সা হয়ে গেল, তোমার ফুটফুটে ছেলেটা বাঁদর হয়ে গেল। অদ্ভুত সব ব্যাপার ঘটছে এখন !

সওদাগর চেঁচামেচি শুরু করে দিল রাগে অন্ধ হয়ে। বলল—চালাকি করার জায়গা পাও নি ? নিশ্চয়ই তুমি আমার ছেলেকে কোথাও লুকিয়ে রেখেছ। এখন ভালোয় ভালোয় আমার ছেলেকে ফিরিয়ে দাও, নইলে আমি তোমার নামে নালিশ করব।

মহাজন খুব সহজভাবে বলল—তুমি তোমার ছেলেকে রেখে যাওয়ার পর থেকে আমি তাকে ছুঁই নি। যেমন আমার কাছে রেখে গিয়েছিলে, তেমনি বসে আছে সে। আমার চোখের সামনে ছেলেটা বাঁদর হয়ে গেছে, আমার কি করার আছে বল। তুমি কাজীর কাছে নালিশ জানাতে পার, আমি তাঁকেও ঐ একই কথা বলব।

সওদাগর দেখল, মহাজনকে কিছুতেই সে নাড়াতে পারছে না। বাধ্য হয়ে সে তখন কাজির কাছে গেল নালিশ জানাতে।

কাজির নির্দেশ পেয়ে মহাজন এল আদালতে। কাজি তাকে জিজ্ঞেস করলেন—তুমি এর ছেলেকে নিয়ে কি করেছ?

কাজির প্রশ্ন শুনে মহাজন যেন আকাশ থেকে পড়ার ভান করল। বলল—আমি? আমি কেন ওর ছেলেকে নিতে যাব? আমি মুখ্যু লোক, এই পৃথিবীতে কত কি আশ্চর্য কাণ্ড ঘটে, তার কতটুকু বুঝি আমি?

কাজি ওর মুখ থেকেই ব্যাপারটা শোনার জন্য জিজ্ঞেস করলেন—কি কি আশ্চর্য কাণ্ড ঘটেছে, শুনি।

মহাজন নির্বোধের মত খুব সহজভাবে বলল—আমি বাইরে যাবার আগে ওর বাড়িতে এক থলি মোহর রেখে গিয়েছিলুম। দিন দশেক পরে ফিরে এসে দেখি, মোহরগুলো সব পয়সা হয়ে গেল। আবার দেখুন, ও ওর ছেলেকে আমার পাশে বসিয়ে রেখে গিয়েছিল, দেখলুম আমার চোখের সামনেই ছেলেটার লেজ গজাল, সে বাঁদর হয়ে গেল। কি ভূতুড়ে কাণ্ড বলুন তো দেখি!

সওদাগর এই মিথ্যে কথা শুনে আর থাকতে পারল না। কাজির সামনেই চেঁচিয়ে উঠল—হুজুর! ও এক নম্বরের মিথ্যেবাদী। আমার ছেলেকে কোথাও লুকিয়ে রেখে মিথ্যে কথা বলছে।

কাজি বুদ্ধিমান লোক। সব শুনে তাঁর বুঝতে বাকি রইল না, আসলে কি ব্যাপার ঘটেছে। দুজনকেই থামিয়ে দিয়ে তিনি বললেন—আচ্ছা, এবার তোমরা যে যার বাড়িতে যাও। ভূতদের নিয়ে আমার চিন্তা নেই, আমি ভূত তাড়ানোর আর ভূতদের শায়েস্তা করার মন্ত্র জানি। আপাতত মহাজন, তুমি তোমার পয়সার থলিটা সওদাগরের হাতে দাও, আর সওদাগরের বাঁদর ছেলে মহাজনের কাছেই থাকুক। কাল সকালের মধ্যে থলির পয়সাগুলো যদি মোহর না হয় কিংবা বাঁদরটা যদি ছেলে না হয়, তাহলে বুঝব এতে তোমাদের কারুর শয়তানি

আছে। তাহলে জেনে রাখবে, তোমাদের দুজনের কপালেই অনেক দুঃখ আছে।

সওদাগর পয়সার থলি সঙ্গে নিয়ে ভাবতে ভাবতে চলল। মহাজনও তার পোষা বাঁদরটিকে নিয়ে হাসতে হাসতে বাড়ি ফিরল।

পরদিন ভোর হতে না হতেই সওদাগর থলির মধ্যে আবার মোহর ভরে মহাজনের বাড়ি গিয়ে হাজির হল। থলিটা ওর সামনে রেখে বলল—কি আশ্চর্য কাণ্ড দেখ, বন্ধু। কাল তোমার কাছ থেকে পয়সাভর্তি থলেটা নিয়ে গিয়েছিলুম, আজ সকালে উঠে দেখি, পয়সাগুলো সব মোহর হয়ে গেছে।

মহাজন হেসে বলল—তাই নাকি ? কি আশ্চর্য, এদিকে সেই বাঁদরটাও আবার তোমার ছেলে হয়ে গিয়েছে। আজ সকালে দেখলুম, ও দিব্যি কথা বলছে। কাজিসাহেবের মন্ত্রে দারুণ কাজ হয়েছে ভাই।

সওদাগরের কাছ থেকে মোহরের থলিটা ফেরৎ নিয়ে মহাজন ওর ছেলেকে ফিরিয়ে দিল। সওদাগরকে বলল—এবার শেষ কথাটা বলি তোমায়। আর কোনদিন আমায় 'বন্ধু' বলে ডেকো না। বন্ধুত্বের মর্যাদা রাখার উপযুক্ত লোক তুমি নও।

গুণী সর্বত্র পূজ্যতে

[প্রাচীনকাল থেকেই আমাদের দেশে লোককথা হয়ে আছে লোকশিক্ষার বাহন। তখন স্কুল-কলেজ ছিল না, কিন্তু লোককথার গল্পগুলো শুনে মানুষ শিক্ষিত হতো। যুগে যুগে আমরা দেখি, মহাপুরুষরাও সাধারণ মানুষকে শেখাবার জন্য লোককথার সাহায্য দিচ্ছেন। বিবেকানন্দও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। গুণীমানুষের কদর যে সর্বত্র, তা বোঝাতে গিয়ে বিবেকানন্দ তাঁর অনুগামীদের এই গল্পটি একদিন বললেন।]

অনেক কাল আগের কথা।

এক রাজ্যের রাজা খুব গান ভালবাসতেন। রাজসভায় ঠাঁই দিয়েছিলেন গুণী সঙ্গীতজ্ঞদের। নিজেও সময় পেলেই গানবাজনার চর্চা করতেন।

রাজা ছিলেন দারুণ খেয়ালী মানুষ। যে কাজ করার কথা একবার মনে হতো, সে কাজ তিনি করবেনই। তা দেশের রাজা, অর্থ আর সামর্থ্য দুই-ই আছে, তাই খেয়াল চরিতার্থ করতে খুব অসুবিধে হতো না।

রাজার একদিন ইচ্ছে হল, স্ফটিক শিলা দিয়ে এক আশ্চর্য মহল তৈরি করবেন। অমনি ইচ্ছার কথা জানালেন মন্ত্রীকে। মন্ত্রী ডাকলেন রাজমিস্ত্রিদের। তারা দিনরাত খেটে স্ফটিক শিলা দিয়ে একটা আশ্চর্য বাড়ি বানিয়ে ফেলল।

সত্যি, দেখার মত বাড়ি বটে। প্রজারা তো বাড়ি দেখে থ। শহরের দ্রষ্টব্য স্থান হয়ে গেল ঐ মহল। দলে দলে লোক আসে ঐ বাড়ি দেখতে। অমন বাড়ি তো তারা কোনদিনই করতে পারবে না। তাই অবাক হয়ে বাড়িটা দেখত, আর যাবার সময় মহলের দেয়ালটা একটু ছুঁয়ে যেত।

প্রজাদেরই কেউ রাজাকে জানাল ব্যাপারটা।

শুনে রাজা একটু চিন্তিতই হলেন। এভাবে প্রতিদিন শত শত মানুষ দেয়ালে হাত দিলে দেয়াল যে নোংরা হয়ে যাবে। একটা কিছু করা দরকার ভেবে রাজা পাহারার ব্যবস্থা করলেন। সেই সঙ্গে আদেশ দিলেন, কেউ যেন দেয়ালে হাত না দেয়।

পাহারাদা'ররা শীত-গ্রীষ্ম বারো মাস দিনরাত কড়া পাহারা দেয়। রাজার বাড়ির দেয়ালে আর কারুর হাত পড়ে না।

শীতকালে একজন সেপাই পাহারা দিচ্ছিল ঐ মহলে। ঠাণ্ডাটা একটু বেশিই পড়েছিল সেই রাতে। যাকে বলে হাড়কাঁপানো শীত। চারদিক নিস্তব্ধ, কুকুরগুলো পর্যন্ত রাস্তায় নেই।

সেই দারুণ ঠাণ্ডার মধ্যে একা দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে সেপাইয়ের মনে খুব দুঃখ হল। এই ঠাণ্ডার রাতে সবাই দিব্যি লেপ মুড়ি দিয়ে আরামে ঘুমোচ্ছে, আর তাকে এমন কষ্ট করতে হচ্ছে! সে যদি রাতে ঐভাবে ঘুমোত, আর রাজাকে যদি তার মত পাহারা দিতে হতো— তাহলে রাজা বুঝতেন গরীব মানুষের কষ্ট কত।

এসব ভাবতে ভাবতে সেপাইয়ের মন বিদ্রোহী হয়ে উঠল। যত ভাবছিল, মন খারাপ হচ্ছিল তত। কি করি, কি করা যায়—সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে হঠাৎ সে দেখল, একটু দূরে এক টুকরো কয়লা পড়ে আছে। সেপাই চটপট ওটা কুড়িয়ে আনল, তারপর ওটা দিয়ে দেয়ালে লিখে ফেলল—

পয়সা যার পৃথিবী তার।
গরীব মানুষের দুঃখ সার॥

অমন চকচকে স্ফটিক-শিলার দেয়ালের ওপর বড় বড় হরফে পরিষ্কার করে নিজের লেখা কথাগুলো দেখে সেপাইয়ের খুব আনন্দ হল। মনের কথাটা প্রকাশ্যে লিখে রাখতে পেরেছে সে। যে যাবে এখান থেকে, সে-ই পড়বে কথাগুলো—এ কথা ভেবে তার আরও আনন্দ হল। রাজা যে তাকে পাহারা দিতে এখানে পাঠিয়েছেন,

কিংবা এমন কথা লেখার পরিণামে তার শাস্তি হতে পারে, তা সে ভুলে গেল।

পরদিন সকালে দেয়ালের গায়ে ঐ লেখা পড়ে অন্যান্য রাজ-কর্মচারীরা অবাক। তারা ছুটে গিয়ে রাজাকে জানাল ঐ লেখার কথা।

রাজা নিজে এসে দেখলেন ঐ লেখা। রাতের সেই পাহারাদার সেপাইকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন—দেয়ালে এসব আজেবাজে লেখা কে লিখেছে?

সেপাই নিজের দোষ কবুল করে বলল—আমি লিখেছি মহারাজ। আমি মনে-প্রাণে যা বিশ্বাস করি, দেয়ালে তাই লিখেছি।

সামান্য একজন সেপাইয়ের মুখে অমন স্পষ্ট কথা শুনে রাজা একটু অবাকই হয়েছিলেন। একটু রাগও হয়েছিল; কিন্তু কিছুই প্রকাশ না করে সেপাইকে জিজ্ঞেস করলেন—তুমি তাহলে শুধু টাকাপয়সা চাও?

সেপাই সঙ্গে সঙ্গে বলল—হ্যাঁ মহারাজ, আমি টাকাপয়সা চাই। কারণ আমি দেখছি টাকাপয়সা থাকলে দুঃখ অনেক কমে যায়।

রাজা বললেন—ঠিক আছে, আমি তোমাকে অনেক টাকা-পয়সা, সোনা-রূপো দেবো।

রাজা বলে কথা। ধনদৌলতের তো অভাব নেই। রয়েছে পুরো রাজ্যটাই। নিজের নামে শত শত একর জমি, অনেক সাজানো বাগান।

এমনই একটা বাগানের একটি সাজানো-গোছানো ঘরে প্রচুর সোনা আর রূপো ভরে দিয়ে রাজা সেখানে আটকে রাখলেন সেপাইকে। বললেন—তুমি টাকাপয়সা চেয়েছিলে, তোমাকে প্রচুর ধনদৌলত দিলাম, কিন্তু স্বাধীনতা কেড়ে নিলাম। দেখ, এবার কত সুখ পাও তুমি।

বেচারী সেপাইয়ের আর কি করার ছিল? তাকে বন্দী হতে হল সোনা-রূপো ভর্তি ঐ ঘরে।

রাজার এই কাজে আর কেউ কষ্ট পেল কিনা জানি না, তবে সব

ঘটনা শুনে রাজার একমাত্র মেয়ের মন খুব খারাপ হয়ে গেল। মেয়েটা এমনিতেই ছিল একটু পরদুঃখকাতর। সত্যি কথা লিখতে গিয়ে সেপাইকে এমন যন্ত্রণা ভোগ করতে হচ্ছে দেখে তার খুব কষ্ট হল। সে কেবলই ভাবতে লাগল, কিভাবে সেপাইকে সাহায্য করে তাকে ঐ রকম নিষ্ঠুর বন্দীজীবন থেকে উদ্ধার করবে।

ঐ নগরে একজন খুব নামী স্বর্ণকার ছিল। রাজকুমারী গোপনে স্বর্ণকারের সঙ্গে যোগাযোগ করল। তাকে অনুরোধ করল, যে কোন ভাবে হোক, ঐ সেপাইয়ের মুক্তির একটা উপায় বের করে দিতেই হবে।

অনেক ভেবে স্বর্ণকার একটা উপায় বের করল। ঐ ঘরের এক কোণে একটা সিঁধ কাটল সে। আর, সেই জায়গা দিয়েই প্রতিদিন রাজকুমারী সেপাইকে খাবার পাঠিয়ে দিত।

রাজার অত্যাচার যত বাড়তে লাগল, সেপাইয়ের প্রতি রাজকুমারীর দরদও ততই বাড়তে লাগল। মনে মনে সে প্রতিজ্ঞা করল, যে কোন উপায়ে সে সেপাইকে মুক্ত করবে।

এদিকে সেপাই প্রতিদিন খানিকটা করে সোনা ঐ সিঁধকাটা জায়গা দিয়ে বের করে রাজকুমারীকে দিতে লাগল। রাজকুমারী সেই সোনা নিজের কাছে না রেখে স্বর্ণকারের কাছে পাঠিয়ে দিতে লাগল।

স্বর্ণকার সেই সোনা দিয়ে এমন একটা ছাগল তৈরি করল যা দেখতে সুন্দর তো হলই, সেই সঙ্গে তার আর একটা গুণ হল, মধুর সুরে গান গাইতে পারা।

একদিন স্বর্ণকার আরও বড় করে সিঁধ কেটে সোনার ছাগলটাকে ঢুকিয়ে দিল সেপাইয়ের ঘরে।

ছাগলটাকে পেয়ে সেপাইয়ের একাকীত্বের সমস্যার কিছুটা সমাধান হল। এতকাল একা ঘরে মনমরা হয়ে কাল কাটাত। এবার ছাগল সাথী পেয়ে একা থেকে যে বোকা হচ্ছিল তার থেকে বাঁচল।

একদিন রাজা বেড়াতে এসেছিলেন সেপাইয়ের ঘরের লাগোয়া বাগানটিতে। হঠাৎ এক সুমধুর গান তার কানে এল।

তিনি ঠিক বুঝে উঠতে পারলেন না, কোথা থেকে এই মধুর গান ভেসে আসছে।

পরদিন রাজকুমারী আর মন্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে রাজা ফের এলেন ঐ বাগানে। সেদিনও তিনি শুনতে পেলেন মনমাতানো ঐ সুমধুর গান। এবার শব্দ অনুসরণ করে তিনি বুঝলেন, গানটা ভেসে আসছে বাগানের লাগোয়া ঘরটা থেকে।

রাজা ততদিনে ভুলেই গিয়েছিলেন সেপাইয়ের কথা। ঐ ঘরে যে সেপাইটিকে তিনি বন্দি করে রেখেছিলেন তাও তার মনে ছিল না। গলার আওয়াজ ধরে তিনি ঐ ঘরের কাছে এলেন। তারপর লোক ডেকে খোজ নিতে বললেন, কে এমন সুন্দর গান গাইছে। রাজার হুকুম মত খোজ নিয়ে জানা গেল একটা সোনার ছাগল এ গান গাইছে।

ছাগল তখনও গান গাইছিল।

রাজা তো সব দেখেশুনে অবাক। একে সোনার ছাগল, তার ওপর এমন সুন্দর গান গায়—অবাক করা কাণ্ডই বটে।

এগিয়ে গিয়ে তিনি ছাগলটিকে ধরলেন। দেখতে চাইলেন, ওর শরীরের ভেতরে কি আছে। চেষ্টাও করলেন অনেক, কিন্তু কিছুই দেখতে পেলেন না।

তখন ডাক পড়ল সেই স্বর্ণকারের। সে এসে চটপট ছাগলের দেহটাকে খুলে ফেলল।

আবার অবাক হবার পালা। এবার রাজামশাই দেখলেন, ছাগলের পেটে রয়েছে এক যুবক। রাজা তাকে দেখে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন—তুমি কে?

যুবক বলল—মাহারাজ, আমি সেই হতভাগ্য সেপাই। যাকে আপনি শাস্তি দেবার জন্য এখানে বন্দী করে রেখেছেন।

রাজা লজ্জিত হয়ে বললেন—তুমি যে এত সুন্দর গান গাইতে পার তা আমার ধারণা ছিল না। যাই হোক, আজ থেকে তুমি আমার রাজসভায় স্থান পেলে। এখন থেকে প্রতিদিন তুমি আমায় তোমার মধুর কণ্ঠের গান শোনাবে।

সেপাই শুনে তো মহাখুশী। একদিকে তার কষ্ট দূর হল, অন্যদিকে সে নিজ গুণের সমাদর পেল।

প্রকৃত গুরু

[আত্মজ্ঞান লাভ একটা দরুণ ব্যাপার। যে মানুষের আত্মজ্ঞান লাভ হয় সে নিজেকে দেখতে পায় এবং প্রকৃত জ্ঞানী হয়ে ওঠে। তার চেতনা খুলে যায়, সে সর্বভূতে ঈশ্বরকে দেখতে পায়। অনুগামীদের এই কথা বোঝাতে বিবেকানন্দ আচার্য শঙ্করের একটি গল্প বললেন।]

ভরেতে আজ পর্যন্ত যতজন জ্ঞানী পুরুষ জন্মেছেন, শঙ্করাচার্যের নাম তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য।

অষ্টম শতাব্দীতে তাঁর জন্ম হয়। ভারতবর্ষে তখন বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ছিল খুব বেশি। বৌদ্ধধর্মের চাপে হিন্দুধর্ম প্রায় লুপ্ত হয়ে যেতে বসেছিল, বহু হিন্দু বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিল। হিন্দুধর্মের সেই নিদারুণ সঙ্কটের সময়ে শঙ্করাচার্য হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে আবার ভারতে হিন্দুধর্মকে স্বস্থানে বসিয়েছিলেন।

শঙ্করাচার্য শুধু পণ্ডিত মানুষ ছিলেন না, তিনি ছিলেন ব্রহ্মজ্ঞানী। সারা ভারতবর্ষে তিনি প্রচার করেছিলেন অদ্বৈতবাদ। 'দ্বৈত' শব্দটির অর্থ, দুই ; 'অ' অর্থ 'না,—অর্থাৎ 'অদ্বৈতবাদ কথাটির অর্থ, দুই নয়, এমন মতবাদ। এই বিরাট পৃথিবীতে আমরা বিভিন্ন জিনিসের প্রভেদ দেখি—বিভিন্ন ধর্মের, বিভিন্ন মানুষের। কিন্তু এই পার্থক্য প্রকৃত পার্থক্য নয়—সব কিছুই এক, এই কথাই প্রচার করেছিলেন শঙ্করাচার্য।

শঙ্করাচার্য তখন কাশীতে। একদিন গঙ্গায় স্নান করে ফিরে আসার সময় দেখলেন, একজন চণ্ডাল চারটে কুকুর সঙ্গে নিয়ে ঐ পথে আসছে।

শঙ্করাচার্য একটু সরে দাঁড়িয়ে লোকটিকে পথ করে দিলেন। ইচ্ছে করেই, যাতে তাঁর গায়ে ছোঁয়া না লাগে। সদ্য গঙ্গাস্নান সেরে এসেছেন, এই সময় চণ্ডাল বা কুকুরকে ছুঁলে অপবিত্র হতে হবে যে।

চণ্ডাল দূর থেকেই লক্ষ্য করেছিল, শঙ্করাচার্য তার দিকে আর না

এগিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছেন, যাতে তার ছোঁয়া না লাগে সেজন্য পথ ছেড়ে দিয়েছেন। এই চণ্ডাল নীচু জাতির লোক হলেও একেবারে মূর্খ ছিল না। শঙ্করাচার্যকে সে চিনতো, তিনি যে বিরাট জ্ঞানী পুরুষ, সে কথাও সে জানত। অমন জ্ঞানী মানুষটি তার ছোঁয়া বাচাবার জন্য সরে দাঁড়ালেন দেখে সে বেশ ক্ষুব্ধই হল। নিজের অভিমানকে সে আর চেপে রাখতে পারল না।

একেবারে শঙ্করাচার্যের মুখোমুখি হয়ে নিজেই দাঁড়িয়ে পড়ল। একটু ব্যঙ্গের সুরেই তাকে বলল—তুমি তো জ্ঞানী পুরুষ, বেদান্তের অদ্বৈতবাদ প্রচার করে বেড়াও সব জায়গায়, তোমার মত মানুষের ছোঁয়াছুঁয়ির এমন বাছবিচার করা কি সাজে? আমাকে ছুঁলে তুমি অপবিত্র হবে বলে মনে করছ, কিন্তু ভেবে দেখ তো, কত ভুল করছ তুমি। আমাদের জাত আলাদা, কিন্তু দুজনের শরীরই তো একই পঞ্চ ভৌতিক উপাদানে তৈরি। তোমার ভেতরে যে আত্মা রয়েছেন, আর আমার মধ্যে রয়েছে যে আত্মা, তারও রূপ এক। তোমার-আমার চিন্তায় মালিন্য থাকতে পারে, কিন্তু আমাদের দুজনের আত্মাই শুদ্ধ—কোন পাপ, কোন নীচতা, কোন মালিন্য সেই আত্মাকে কখনই স্পর্শ করতে পারে নি তাহলেই বুঝে দেখ, অহেতুক ছোঁয়াছুঁয়ির বাছবিচার করে কত বড় ভুল করছ তুমি।

সামান্য এক চণ্ডালের মুখে এত বড় এক সত্যি কথা শুনে শঙ্করের চমক ভাঙ্গল। নিজের কাছে নিজেই লজ্জা পেলেন। সত্যিই তো, তিনি নিজে বড় মুখে ধর্ম প্রচার করে বেড়ান, কোন কিছুই দ্বৈত নয়, অথচ মানুষে মানুষে তিনি ভেদ আনছেন! দুটি মানুষের শরীর, মন বা প্রকৃতিতে ভেদ বা পার্থক্য থাকতে পারে, কিন্তু তাদের আত্মার মধ্যে তো কোন পার্থক্য নেই কোন ভেদ নেই। সেখানে সব মানুষ এক।

শঙ্কর বুঝলেন, এতদিন তিনি তত্ত্বকথা প্রচার করেছেন মাত্র, কিন্তু নিজে প্রকৃত জ্ঞান লাভ করেন নি। এই চণ্ডাল তাঁর মন থেকে

অন্ধকার দূর করে দিয়েছে, প্রকৃত সত্যকে তিনি এখন অনুভব করতে পারছেন।

ছোঁয়াছুঁয়ির ভেদবিচার আর রইল না তাঁর মনে। চণ্ডালকে নমস্কার করে তিনি তাঁকে আলিঙ্গন করলেন। বললেন—তুমি আমার জ্ঞানচক্ষু খুলে দিয়েছ, তুমিই হলে আমার প্রকৃত গুরু।

এই বলে ওখানে দাঁড়িয়েই তিনি একটি স্তোত্র রচনা করলেন। স্তোত্রটির নাম 'মণীষা পঞ্চক'। শঙ্করাচার্যের রচিত অসংখ্য স্তোত্রের মধ্যে এই স্তোত্রটি কিন্তু বিশেষভাবে বিখ্যাত হয়ে আছে। স্তোত্রটির প্রতিটি স্তবকের শেষে শঙ্কর বলছেন: 'অদ্বৈতবাদের প্রকৃত তত্ত্বকে যে আমার চোখের সামনে তুলে ধরেছে, সে ব্রাহ্মণই হোক আর চণ্ডালই হোক, সেই আমার প্রকৃত গুরু।'

মহৎ প্রাণের মানুষ ছিলেন শঙ্করাচার্য, তাই চণ্ডালকে গুরু বলে স্বীকার করতে তিনি দ্বিধাবোধ করেন নি। ভারতবর্ষের মানুষও তেমনি যতদিন অস্পৃশ্যতাকে ত্যাগ করতে না পারছে, ততদিন ভারতবর্ষের প্রকৃত উন্নতি হবে না।

মায়া দর্শন

[জগৎ-সংসার মায়ার অধীন। বিশ্বসংসারের সব কিছুই অলীক কল্পনা মাত্র। আমাদের চারপাশের এত জিনিসপত্র, মানুষজন সবই তো মায়া—আজ আছে,

কাল থাকবে না। ঠিক যেন স্বপ্নের মত। স্বপ্ন যখন দেখছি, তখন মনে হয় তা কত সত্যি, অথচ ঘুম ভাঙলে দেখি, কোথাও কিছু নেই। বড় কঠিন জিনিস এই মায়া। কথাপ্রসঙ্গে একদিন যখন অনুগামীরা মায়ার কথা তুললেন, তখন বিবেকানন্দ তাঁদের বললেন এই গল্পটি।]

মায়া, মায়া আর মায়া। গোটা পৃথিবীটাই মায়ার অধীন। মায়াই আমাদের মোহগ্রস্ত করে রেখেছে, প্রকৃত সত্যকে দেখতে, শুনতে বা বুঝতে দিচ্ছে না। মানুষ সব বোঝে, কিন্তু মায়ার প্রভাবেই যা বোঝে তাকে কাজে পরিণত করতে পারে না। মায়াজাল হল ঈশ্বরের সবচেয়ে আশ্চর্য সৃষ্টি। এর হাত থেকে মুক্তি পাওয়া বড় কঠিন।

ঢেঁকিতে চড়ে স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল ঘুরতে ঘুরতে নারদ বহুবার শুনেছেন এ কথা। শুনেছেন, কিন্তু বোঝেন নি। তিনি নিজে দেবতা, মায়ার বাঁধনে আবদ্ধ নন। কিন্তু বড় সখ হল তাঁর, মায়া জিনিসটা কি তা বুঝবেন।

শ্রীকৃষ্ণের বড় ভক্ত হলেন নারদ। দিবারাত্র হরিনাম করেন, হরিনাম ছাড়া আর কিছুই বোঝেন না, জানেন না। ভক্তের কাছে ভগবান বাঁধা থাকেন। শ্রীহরিও তাই বড় ভালবাসেন নারদকে। নারদ তাঁর মনের সব কথা বলেন শ্রীহরিকে, ভগবানও তাঁর ভক্তের সব কথা রাখেন।

নারদ গিয়ে ধরলেন শ্রীহরিকে—প্রভু, সবার মুখেই শুনি, জগৎ-সংসারকে আপনি মায়ায় আবদ্ধ করে রেখেছেন। কিন্তু মায়া কি

জিনিষ তা জানি না। আপনি যদি আমাকে আপনার মায়ার স্বরূপ একবার দেখান, তাহলে খুব খুশি হব ভগবান।

ভগবান তো নারদের কথা শুনে মনে মনে হাসলেন। কিন্তু ভক্তকে নিরাশ করলেন না। বললেন—বেশ তো একদিন দেখাবো তোমাকে।

দিন কয়েক কাটল। শ্রীকৃষ্ণ একদিন নারদকে হঠাৎ বললেন—চল, আমরা দুজনে একটু বেড়িয়ে আসি।

ভগবান নিজে হবেন বেড়ানোর সঙ্গী—এর চেয়ে আনন্দের কথা আর কি হতে পারে। নারদ তো তখুনি এক পায়ে খাড়া।

দুজনে পথে বেরোলেন। স্বর্গ থেকে এলেন মর্ত্যে। শহর ছাড়িয়ে পৌঁছুলেন গ্রামে। গ্রামের পর গ্রাম পেরিয়ে শেষে হাজির হলেন এক মরুভূমিতে।

কোথায় সবুজ গাছে ভরা গ্রাম্য পথ, আর কোথায় মরুভূমির বালির রাজত্ব। দুয়ের মধ্যে কত তফাৎ। একটাতে চোখ জুড়িয়ে যায়, আর অন্যটিতে চোখ মেলে তাকাতে পর্যন্ত কষ্ট হয়। চারদিকে শুধু বালি আর বালি। যতদূর চোখ যায়, শুধু বালির রাজত্ব। কচিৎ কোথাও দু-চারটি ছোট জলাশয়কে কেন্দ্র করে গুটিকয়েক ছোট ছোট গাছ। তাও আবার সে সব গাছে কাঁটা ভর্তি। তবু ঐ গাছগুলোই ধু ধু বালির রাজ্যে একমাত্র সবুজ।

জনমানবহীন সেই বালির পথ ধরেই নারদকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে চলেছিলেন শ্রীকৃষ্ণ। বেলা ক্রমশ বাড়ছে। যত বাড়ছে, ততই যেন কষ্ট বাড়ছে। বালির দিকে তাকানো যাচ্ছে না, মাঝে মাঝে দমকা গরম বাতাস চোখেমুখে ঝাপটা দিচ্ছে, বালি ঢুকে যাচ্ছে চোখের মধ্যে—চোখ মেলে রাখাই দায়। তার ওপর পায়ের তলার বালি উঠেছে তেতে, পা রাখাও কষ্টকর।

এর ওপর আর এক সমস্যা। গলা শুকিয়ে কাট হয়ে আসছে দুজনেরই। তবু শ্রীকৃষ্ণের কষ্টটা যেন একটু বেশিই। হাজার হোক, থাকেন দুঃখকষ্টহীন বৈকুণ্ঠে। নারদ অনুভব করছিলেন, প্রভুর এই

কষ্ট। নিজেকে খুব অপরাধী মনে করছিলেন তিনি, কিন্তু মুখ ফুটে সে কথা ভগবানকে বলতে পারছিলেন না।

হঠাৎ শ্রীকৃষ্ণ যেন খুবই তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়লেন। নারদের দিকে তাকিয়ে বললেন—বড় তেষ্টা পেয়েছে নারদ। একটু জল খাওয়াতে পার?

নিত্য যাঁকে ভজনা করেন, সেই ভগবান শ্রীহরির কষ্ট? নারদ তো কথাটা শুনেই ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। কিছু না ভেবেই তাড়াতাড়ি বললেন—পারি প্রভু।

শ্রীকৃষ্ণ কাতর হয়ে বললেন—কিন্তু এখানে তুমি জল পাবে কোথায়? এ তো মরুভূমি, জল নেই, শুকনো জায়গা।

এবার নারদের খেয়াল হল, তিনি রয়েছেন জলহীন মরুভূমিতে। কিন্তু তা বলে তো ভগবানকে তৃষ্ণার্ত রাখা যায় না। যে কোন ভাবে হোক, জল যোগাড় করতেই হবে।

নারদ তাকালেন সামনের দিকে। একটু দূরেই নজরে পড়ল ছোট একটা মন্দির। বললেন—প্রভু, ঐ তো একটু দূরেই একটা মন্দির দেখা যাচ্ছে। ওখান থেকে এখুনি জল নিয়ে আসছি আমি।

নারদ তাড়াতড়ি এগিয়ে চললেন। উদ্দেশ্য, যত তাড়াতড়ি সম্ভব জল নিয়ে ফিরে এসে শ্রীহরির তৃষ্ণা মেটানো। ভগবান তাঁর পথ চেয়ে বসে থাকবেন, একথা ভাবতেই নারদের বুকের ভেতরটায় মোচড় দিয়ে উঠল। আকুল আগ্রহে তিনি ছুটে চললেন।

কিন্তু দূর থেকে দেখে যতটা কাছে মনে হয়েছিল, মন্দিরটা ঠিক ততটা কাছে নয়। তাই বেশ সময় লাগল মন্দিরে পৌছুতে। ছোটর উপর মন্দ নয় মন্দিরটা, মনে মনে ভাবল নারদ। কিন্তু মন্দিরের দরজা বন্ধ। কাছে পিটে কোন লোকও নেই। মন্দিরের পাশেই একটা বাড়ি দেখতে পেয়ে তারই দরজায় করাঘাত করলেন নারদ। দরজা খুলে বেরিয়ে এল একটি সুন্দরী মেয়ে।

সে জিজ্ঞেস করল—কি চাই?

নারদ কথার উত্তর দেবেন কি, মেয়েটিকে দেখে তাঁর মুখ দিয়ে

কথা সরছিল না। এই মরুভূমির রাজ্যে এমন পরমাসুন্দরী কন্যা এল কোথা থেকে ?

মেয়েটি নারদকে চুপ করে থাকতে দেখে বলল—এই গরমে রোদে দাঁড়িয়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছে আপনার। আসুন না, ভেতরে এসে বসুন।

নারদের কি যে হল, মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে তার মুখের ওপর 'না' বলতে পারলেন না। ভগবানের তৃষ্ণার কথা তাঁর আর মনেই রইল না। মেয়েটির ঘরে গিয়ে বসলেন। মেয়েটির সাথে তাঁর পরিচয় হল। একথা থেকে সে কথা। নারদের খুব ভালো লাগছিল মেয়েটির সঙ্গে আলাপ করতে। তিনিও ওর পরিচয় জিজ্ঞেস করলেন। দুজনে গল্পে একদম মশগুল হয়ে রইল।

এমনিভাবে সময় কেটে যেতে লাগল। ভগবান যে ওদিকে আকণ্ঠ তৃষ্ণা নিয়ে তাঁরই পথ চেয়ে বসে আছেন, সে কথা একবারের জন্যও নারদের মনে পড়ল না। গল্পে গল্পে দুপুর পেরিয়ে সন্ধ্যে হল। শ্রীকৃষ্ণের কাছে সেদিন আর ফিরলেন না তিনি।

পরদিন নারদ নিজেই হাজির হলেন মেয়েটির কাছে। আলাপ চলল সারা দিন ধরে। নারদের মন খুব খুশী। কি জন্য তিনি এখানে এসেছিলেন, তিনি তা একেবারেই ভুলে গিয়েছেন তখন—মেয়েটিই তখন তাঁর একমাত্র চিন্তা, দিনের শেষে মেয়েটি নারদকে আলাপ করিয়ে দিল তার বাবার সঙ্গে। নারদ তাঁর কাছে সরাসরি মেয়েটিকে বিয়ের প্রস্তাব করলেন। মেয়েটির বাবা এই প্রস্তাবে আপত্তি করলেন না। মেয়েটির সঙ্গে নারদের বিয়ে হল।

মেয়েটির বাবার বিষয়সম্পত্তি ছিল প্রচুর। প্রচুর টাকাপয়সা, জমি, পুকুর, গরু এসব তো ছিলই, ভালো বসতবাড়িও ছিল। মেয়েটিই তাঁর একমাত্র সন্তান। তাকে বিয়ে করার সূত্রে নারদ পেলেন শ্বশুরের অনেক সম্পত্তি, কাজেই বিয়ের পর নারদ বেশ সুখেই ঘর-সংসার করতে লাগলেন। অভাব-অনটন নেই, মেয়েটিও তাঁকে খুব ভালবাসে এই ভাবে তার দিন কাটতে লাগল আনন্দে।

এরই মধ্যে একদিন মেয়েটির বাবা মারা গেলেন। এবার তাঁর সব বিষয়সম্পত্তির মালিক হলেন নারদ। বিষয়সম্পত্তি থাকলেই তার দেখাশোনা করতে হয়। স্বাভাবিক নিয়মেই দেখাশোনা করার ভার পড়ল নারদের ওপর। ঘর-সংসারের সঙ্গে এবার বিষয়সম্পত্তির বাঁধনে বাঁধা পড়লেন নারদ।

দেখতে দেখতে বারো বছর কেটে গেল। এর মধ্যে নারদের তিনটি ছেলেমেয়ে হল। নারদ এখন পুরোপুরি সংসারী মানুষ।

কিন্তু মানুষের সব দিন সমান যায় না। হঠাৎ একদিন নারদের বিপদ ঘনিয়ে এল।

কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ আকাশ ভরে গেল কালো মেঘে। শুরু হল অসময়ের বৃষ্টি। এত মেঘ, এত বৃষ্টি, এর আগে দেখে নি কেউ কোনদিন। শ্রাবণের ধারাও যেন হার মানে তার কাছে। শুধু কি বৃষ্টি, সেই সঙ্গে ঝড়ের তাণ্ডব। দমকা হাওয়ায় উড়িয়ে নিতে চায় সব কিছু।

এক দিন, দু দিন, তিন দিন কেটে গেল, তবু ঝড়-বৃষ্টি থামার লক্ষণ নেই। বরং ঝড়ের বেগ যেন আরও বাড়ল, বৃষ্টিও পড়তে লাগল অবিরাম। পুকুর-খাল-বিল-নদী সব ডুবল। শেষে আর জল ধরার জায়গা রইল না। নদী উপচে পড়ল। মাঠ ডুবল, পথ ডুবল, গ্রাম ডুবল, শেষে জল এসে ঢুকতে লাগল ঘরের মধ্যে। অসহায় মানুষদের ঘর ছেড়ে এসে দাঁড়াতে হল পথে। খরস্রোতা বন্যার জল ভেঙ্গে দলে দলে মানুষ নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে এগিয়ে চলল।

নারদের ঘরেও জল ঢুকেছিল। জল ক্রমশ বাড়ছে, ঘরের ভেতরে থাকা আর নিরাপদ নয়। নারদ তাই স্ত্রী-পুত্রদের সঙ্গে নিয়ে অন্যান্যদের মত ঘর ছেড়ে বাইরে বেরোলেন। চললেন নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে।

কিন্তু পথ চলাও কি সহজ? একে কোমর সমান জল, তার ওপর জলে প্রচণ্ড স্রোত। দাঁড়িয়েই থাকা যায় না তো এগিয়ে চলা।

মনে হচ্ছে যেন ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। বাচ্চারা তো এমন স্রোত সামলাতেই পারবে না। অনেক চিন্তা করে নারদ তাই ছোট ছেলেটাকে নিজের কাঁধে তুলে নিলেন, আর দুই ছেলেকে চেপে রাখলেন এক হাতে, অন্য হাতে শক্ত করে ধরলেন স্ত্রীকে।

খুব সাবধানে জল ভেঙ্গে সবাইকে নিয়ে এগিয়ে চললেন নারদ।

কিন্তু, যাবেন কোথায়? কোথায় নিরাপদ আশ্রয়? যেদিকে তাকানো যায় শুধু জল আর জল। ডাঙ্গা দেখা যাচ্ছে না কোথাও। শরীর ক্রমশ ক্লান্ত আর অবসন্ন হয়ে আসছে।

এর মধ্যে আর এক বিপদ। আর, বিপদ কখনও একা আসে না।

হঠাৎ কাঁধের ছেলেটি জলে পড়ে গেল। পড়া মাত্র সে ভেসে গেল অনেক দূরে। তাকে ধরতে গিয়ে হাতের একটি ছেলেও গেল ভেসে।

স্ত্রীর সঙ্গেও নারদ হা-হুতাশ করলেন খানিকক্ষণ। কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকার বা চিন্তা করারও তো সময় নেই। জলের তোড় ক্রমশ বেড়ে চলেছে। সাবধান না হলে সকলকে যে ভেসে যেতে হবে। এক হাতে স্ত্রীর হাত, অন্য হাতে বাকি পুত্রের হাত শক্ত করে ধরে নারদ সব শোক ভুলে এগোতে লাগলেন।

ভেবেছিলেন শক্ত করে ধরে রাখবেন ওদের দুজনকেই, কিন্তু পারলেন না। হাতে জল লেগে হাত ক্রমশ অবশ হয়ে এল। কখন যে হাতছাড়া হয়ে গেল শেষ ছেলেটি, তা জানতেও পারলেন না। যখন খেয়াল হল, তখন সে ভেসে গেছে নাগালের বাইরে।

নিয়তির পরিহাসে তিন ছেলে গেল, বাকি রইল কেবল স্ত্রী। বলতে গেলে আপন বলতে নারদের রইল শুধু ঐ একজন। ঘরবাড়ি গেছে, ছেলেরা গেছে—এখন আছে শুধু স্ত্রী। নারদের মন হাহাকার করে উঠল। এমন সাধের সংসার এত দ্রুত ভাঙ্গবে, তা তিনি কল্পনাও করেন নি।

সব গেছে যাক, এখন যেন শেষ কাছের মানুষ স্ত্রী হাতছাড়া না হয়। নারদ তাকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরলেন। যেন তিনি পাশে থাকেন।

কিন্তু নারদের সেই ইচ্ছাও পূর্ণ হল না।

এতক্ষণের পরিশ্রমে শরীর অবসন্ন! হাত অবশ হয়ে আপনি এলিয়ে পড়ল। স্ত্রীও ভেসে গেলেন এক সময়। তখন আর কিছুই করার ছিল না। আকুল হয়ে শুধু চেয়ে দেখলেন স্ত্রীর ভেসে যাওয়া। একটা আচ্ছন্ন ভাব নিয়ে ভেসে রইলেন জলে।

স্রোতের টানে ভাসতে ভাসতে নারদ যে কোথায় চলে এলেন, নিজেই জানেন না। এক সময় একটা উঁচু জায়গায় এসে ঠেকলেন। সেখানে তখনও জল ওঠে নি, তাই আর ভাসতে হল না। আচ্ছন্ন অবস্থায় ওখানে পড়ে রইলেন অনেকক্ষণ।

এক সময় আচ্ছন্ন ভাবটা কাটল, উঠে বসলেন নারদ। চারদিকে তাকিয়ে বুঝলেন, অচেনা একটা জায়গায় এসে পড়েছেন তিনি। একটু একটু করে নিজের দুর্ভাগ্যের সব কথা মনে পড়ল তাঁর। বুক ফাটা কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন নারদ। এ কি হল তাঁর? ঘরবাড়ি, সম্পদ, পরিজন সবই গেছে, কিছুই অবশিষ্ট নেই—শুধু তিনি একা। ঈশ্বর তাঁকেই বা বাঁচিয়ে রাখলেন কেন? এই দুর্ভাগ্যের বোঝা নিয়ে কিভাবে তিনি বাকি জীবন কাটাবেন? সেই জনমানবহীন নিস্তব্ধ জায়গায় নারদ উন্মাদের মত বিলাপ করতে লাগলেন।

এমন সময় পেছন থেকে অতি কোমল, অতি সুমধুর কয়েকটি কথা কানে ভেসে এল। চমকে উঠে পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখেন, দাঁড়িয়ে আছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। মুখে তাঁর স্মিত হাসির রেখা। বললেন—কই নারদ, জল কই? আধ ঘণ্টা হয়ে গেল জল নিয়ে এসেছ, তা জল কই?

—আধ ঘণ্টা? স্থান-কাল-পাত্র ভুলে চিৎকার করে উঠলেন নারদ।

বলছেন কি ভগবান! এক এক দিন করে বারোটা বছর তিনি কাটিয়ে দিলেন, আর ভগবান বলছেন কিনা সময়টা মোটে আধ ঘণ্টা। কিন্তু ভগবান তো মিথ্যে বলবেন না। তাহলে ভুলটা তাঁরই।

মায়ায় আচ্ছন্ন হয়ে ছিলেন তিনি। সামান্য আধ ঘণ্টা সময়কে তাই তাঁর মনে হয়েছে বারো বছর।

নারদ আর থাকতে পারলেন না। শ্রীকৃষ্ণের পায়ে লুটিয়ে পড়ে বললেন—প্রভু, আপনি সত্যিই করুণাময়। মায়ার স্বরূপ দেখতে চেয়েছিলাম আমি, আপনি চোখে আঙ্গুল দিয়ে আমায় দেখিয়ে দিলেন মায়ার প্রভাব কত ব্যাপক. খুব হয়েছে, আর নয়, চলুন আমরা এবার ফিরে যাই। রওনা হবার আগে হে আমার ঈশ্বর, হে আমার প্রভু আপনি আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম গ্রহন করুন।

জয়-পরাজয়

[জীবনে জয় ও পরাজয় দুই-ই আছে, উভয়কেই সহজভাবে নিতে হয়। প্রচলিত একটি কাহিনীর উল্লেখ করে বিবেকানন্দ তাঁর অনুগামীদের সহজভাবে বুঝিয়ে দিলেন এই বিরাট উপলব্ধিকে।]

প্রাচীন ত্রিপুরার এক শক্তিশালী রাজার নাম রুদ্রনারায়ণ। পরাক্রমশালী রাজা বলতে যা বোঝায়, তিনি ছিলেন তাই। একদিকে তাঁর ছিল বিরাট সেনাবাহিনী, অন্যদিকে রাজ্যের সর্বত্র সুশাসন প্রবর্তন করে তিনি প্রজাদের আস্থা ও শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন। দেশের মানুষ এমন লোককে রাজা হিসেবে পেয়ে গর্ব বোধ করত।

রুদ্রনারায়ণের চরিত্রের একটা বড় গুণ ছিল, তিনি জয়-পরাজয় বলে কিছু মানতেন না। জয়কে বলতেন ঈশ্বরের ইচ্ছা, তেমনি পরাজয়কেও বলতেন ঈশ্বরের ইচ্ছা। এমন মনোভাবের জন্য কোন কিছুকেই তিনি পরোয়া করতেন না।

একবার তাঁর রাজ্যের দক্ষিণদিকে কিছু প্রজা অরাজকতা সৃষ্টি করল। তারা নিরীহ প্রজাদের উপর উৎপীড়ন শুরু করল, রুদ্রনারায়ণকে খাজনা দেওয়া বন্ধ করল।

রুদ্রনারায়ণের কাছে এই খবর পৌছুল। তিনি অরাজকতা দমনের জন্য সেনাবাহিনী পাঠালেন না। শুধু বিদ্রোহীদের উদ্দেশ্যে ঘোষণা করলেন, তারা যদি রাজদ্রোহী হয় তাহলে তাদের কঠোর শাস্তি পেতে হবে।

বিদ্রোহীরা এই ঘটনায় খুবই উৎসাহিত বোধ করল। তারা রীতিমত দল বেঁধে রাজধানীর দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। রাজধানী দখল করে রাজ্য অধিকার করাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য।

রুদ্রনারায়ণের কাছে এই খবর পৌছতেও দেরী হল না। কিন্তু তিনি বিদ্রোহীদের মাঝপথে বাধা দিলেন না। নিজের সেনাবাহিনীর

ক্ষমতার ওপর তাঁর ছিল অগাধ বিশ্বাস। ভাবলেন, আসুক, বিদ্রোহীরা রাজধানীতে। আমার সেনাবাহিনী ওদের এক ফুৎকারে উড়িয়ে দেবে।

কিন্তু মানুষ ভাবে এক, আর হয় আর এক। বিদ্রোহীরা তলে তলে যে কতটা শক্তি সঞ্চয় করেছে, সে সম্বন্ধে রাজার কোন ধারণাই ছিল না। তাই বিদ্রোহীদের সঙ্গে রাজার সেনাবাহিনীর সত্যিই যখন সংঘর্ষ হল, তখন দেখা গেল রাজার সেনাবাহিনীই পরাজিত ও ছত্রভঙ্গ হল। বেশ কিছু সৈন্য আবার বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দিল। বিজয়গর্বে বিদ্রোহীদের নেতা রাজপ্রসাদ অভিমুখে এগোতে লাগল।

রাজা রুদ্রনারায়ণ তখন আর কি কারবেন ? যুদ্ধে পরাজয় হলে রাজ্য ত্যাগ করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। কিছু ধনসম্পদ ও বিশ্বাসী অনুচরকে সঙ্গে নিয়ে তিনি রাজপ্রাসাদ ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে চললেন।

বিদ্রোহী নেতা রাজপ্রাসাদ দখল করে নিজেই সিংহাসনে বসল। উৎসবের ফোয়ারা ছুটল এই উপলক্ষ্যে। একদিকে যখন উৎসবের মত্ততা, অন্য দিকে তখন রুদ্রনারায়ণ অসহায় অবস্থায় কোন রকমে রাজ্যের সীমানায় অবস্থিত নদীটি পেরিয়ে প্রতিবেশী রাজ্যে গিয়ে হাজির হলেন। ঐ রাজ্যের রাজার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করলেন।

প্রতিবেশী এই রাজা ছিলেন রুদ্রনারায়ণের বন্ধু। তিনি তাঁকে খুবই ভালবাসতেন। রুদ্রনারায়ণের এই চরম বিপদের দিনে তিনি তাঁকে বিমুখ করলেন না। বললেন—আপনি নির্ভয়ে যতদিন ইচ্ছা আমার রাজ্যে বাস করুন। একবার পরাজয় হয়েছে বলে বিচলিত হবার কিছু নেই। জয়—পরাজয় তো ভাগ্যের খেলা। আপনি ইচ্ছে করলে আমার সেনাবাহিনীর সাহায্যে আপনার হারানো রাজ্য পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করতে পারেন।

বন্ধু রাজার কথায় রুদ্রনারায়ণের মনে আবার আত্মবিশ্বাস ফিরে এল। পরাজয়কে হাসিমুখে মেনে নিয়ে তিনি এই রাজ্যে বাস করতে শুরু করলেন। কিন্তু বন্ধু রাজার সাহায্য নিয়ে নিজের রাজ্য দখল

করতে তাঁর মন চাইল না। মনে মনে স্থির করলেন, নিজের রাজ্যে যদি দখলই করতে হয় তবে নিজের চেষ্টাতেই তা করবেন, কারুর সাহায্য নিয়ে নয়। অনুচরদের সঙ্গে নিয়ে তিনি একাই যাবেন নিজের রাজ্যে।

তাঁর কথা শুনে অনুচররা তো হায় হায় করে উঠল। বলল—বিদ্রোহীদের ঐ নেতার সম্বন্ধে আপনার কোন ধারণাই নেই রাজা। সে অতি নিষ্ঠুর লোক। আপনি যাতে কোন রকমে সে রাজ্যে ঢুকতে না পারেন, সেজন্য সে চারিদিকে কড়া পাহারা বসিয়ে রেখেছে। আপনি যদি ওর সেনাদের হাতে ধরা পড়েন তাহলে আপনার কি অবস্থা হবে তা ভাবতে পারছেন?

রুদ্রনারায়ণ কিন্তু তাঁর অনুচরদের সাবধানবানীতে কানই দিলেন না। দেশে ফিরে যাবার জন্য তাঁর মন চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। বললেন—আমার পরিণতি যাই হোক না কেন, আমি নিজের দেশের দিকেই যাব। বিদেশ বিভুঁইয়ে এভাবে পড়ে থাকা তো মৃতুর সামিল।

অনুচররা আর কি করবে, রাজার সঙ্গী হল।

নদী পার হয়ে রাজা পা রাখলেন তাঁর দেশের মাটিতে, কথাই আছে, জন্মভূমি স্বর্গের চেয়েও বড়। পরম একটা শান্তি অনুভব করলেন রাজা। কতদিন দেশের জল-মাটি-হাওয়া সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল না—এখন প্রাণ ভরে নিঃশ্বাস নিতে পেরে পরম সুখ অনুভব করছিলেন।

কিন্তু বাদ সাধল এক প্রহরী।

অনুচরদের সঙ্গে রাজাকে সে নৌকো থেকে নামতে দেখেছিল। এগিয়ে এসে রাজাকেই দলের নেতা বুঝতে পেরে তাঁকেই জিজ্ঞেস করল—কে তুমি?

ততক্ষণে আরও অনেক প্রহরী এসে রাজা ও তাঁর অনুচরদের ঘিরে ধরেছে। ওদের হাতে হাতে মারাত্মক সব অস্ত্র। পারলে যেন এখুনি মেরে-ফেলে।

রাজা কিন্তু ওদের দেখে এতটুকু ভয় পেলেন না। ওদের দিকে তাকিয়ে শান্ত ভাবে জিজ্ঞাসা করলেন—তোমরা আমাদের পরিচয় জানতে চাইছ কেন ভাই?

উত্তরে ঝন্ ঝন্ শব্দে প্রহরীরা কোষ থেকে তরবারি বের করে ফেলেছে। প্রথম প্রহরী বলল—আমাদের রাজা আগন্তুকদের ওপর কড়া নজর রাখতে বলেছেন।

রুদ্রনারায়ণ তেমনি সহজ ভাবে জিজ্ঞেস করলেন—কিন্তু কেন? তোমাদের রাজা নবাগতদের এত ভয় পান কেন?

প্রহরী বলল—সতর্ক থাকাই রাজাদের নিয়ম। তার ওপর আমাদের রাজা এই রজ্যের প্রকৃত রাজা ছিলেন না, তিনি আগেকার রাজা রুদ্রনারায়ণকে হঠাৎ আক্রমণ করে রাজা হয়েছেন। সব সময়েই তাই রাজার ভয়, রুদ্রনারায়ণ যে কোন মুহূর্তে তাঁর রাজ্য আক্রমণ করবেন, সিংহাসন কেড়ে নেবেন। তাই তিনি একটু বেশি সতর্ক।

রুদ্রনারায়ণ ভেবেই পেলেন না, তিনি এখন নিঃস্ব ও নিরাশ্রয়, তবু ঐ রাজা তাঁকে এত ভয় পাচ্ছেন কেন। তাহলে কি অন্যায় করেছেন বলেই তাঁর এত ভয়? কই, রুদ্রনারায়ণ তো তাঁকে এতটুকু ভয় পান না—তা তিনি কোন অপরাধ করেন নি বলেই?

একটু ভাবলেন রুদ্রনারায়ণ। তারপর নির্ভয়ে নিজের আত্মপরিচয় দিয়ে বললেন—ভাইসব, আমিই সেই রাজা রুদ্রনারায়ণ। আমাকে তোমাদের রাজার ভয় পাবার কি আছে? আমি তো আজ রাজ্যহারা, নিঃস্ব—তার রাজ্য কেড়ে নেবার এতটুকু ক্ষমতা আমার নেই। এখন আমি তোমাদের সামনে হাজির হয়েছি। তোমরা তোমাদের কর্তব্য কর, আমাকে তোমাদের রাজার সামনে বেঁধে নিয়ে যাও।

প্রহরীরা তো হাঁ করে রুদ্রনারায়ণের দিকে তাকিয়ে রইল অনেকক্ষণ। রাজা যে মিথ্যে বলছেন না, তা বুঝতে তাদের দেরি হল না। সত্যিই রাজার মতই চেহারা, রাজোচিত আচরণ। নইলে কেউ এভাবে শত্রুর কাছে নিয়ে যাবার কথা বলতে পারেন?

প্রহরীদের নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে রাজা বললেন—কই, আমায় নিয়ে চল তোমাদের রাজার কাছে। আমি রাজা ছিলাম বলে তোমরা তোমাদের কর্তব্য পালন করবে না, তা তো হয় না।

রাজার কথা শেষ হল না, তার আগেই প্রহরীরা তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ল। নিজেদের অস্ত্র রাজার পায়ের কাছে রেখে বলল—আমাদের অপরাধ মার্জনা করুন রাজা। আমরা আপনাকে চিনতে পারি নি, তাই অমন কথা বলেছি।

রাজা বললেন—তোমরা তো কোন দোষ কর নি, তোমরা তোমাদের কর্তব্য পালন করেছ। রাজার অধীনে তোমরা কাজ কর, তাঁর নির্দেশ পালন করাই তো তোমাদের কর্তব্য।

তারা হাত জোড় করে বলল—না মহারাজ, অন্তত এক্ষেত্রে আমরা আমাদের কর্তব্য পলন করব না। আমরা চিরকাল আপনাকে শ্রদ্ধা করে এসেছি, এখনও করি। আপনি আবার আমাদের দেশের রাজা হোন, আমরা মনেপ্রাণে তাই চাই।

রাজা বললেন—কিন্তু তা কি করে সম্ভব? এখন আর আমার কিছুই নেই, রাজ্য দখল করার স্বপ্ন তাই আমার পক্ষে বাতুলতা। কোথায় পাব ঐ রাজাকে পরাজিত করার মত শক্তিশালি সেনাবাহিনী?

সৈন্যরা বলল—আমরা আপনার পেছনে আছি মহারাজ। শুধু আমরা কেন, আমাদের মত আপনার অনুগামী আরও অনেক সেনা আপনি পাবেন, তাদের সাহায্যেই আপনার পক্ষে হৃত রাজ্য পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হবে।

সৈনিকরাই রাজাকে নিয়ে গেল নিরাপদ আশ্রয়ে। তারাই রাজাকে সাহায্যের জন্য গড়ে তুলল সংগঠন। সাধারণ মানুষ তো বটেই, বহু সেনাও যোগ দিল ঐ সংগঠনে। গোপনে সর্বত্র প্রচার হয়ে গেল, রুদ্রনারায়ণ ফিরে এসেছেন, তাঁকে সিংহাসনে বসাতে হবে।

রুদ্রনারায়ণকে কিছুই করতে হল না, ঐ সংগঠনের নেতারাই রাজ্য দখলের পরিকল্পনা ছকে ফেলল। তাদেরই এক ছোট দল অতর্কিতে রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করে ঐ বিদ্রোহী রাজাকে হত্যা করল। ঐ রাজার বহু সমর্থককে গ্রেপ্তার করে কারাগারে পুরে দিল।

প্রজাদের সমর্থন ও শুভেচ্ছা নিয়ে রুদ্রনারায়ণ আবার বসলেন সিংহাসনে। আনন্দের বন্যা বয়ে গেল সারা দেশে।

সিংহাসন ফিরে পেয়েও কিন্তু রুদ্রনারায়ণের এতটুকু পরিবর্তন হল না। তিনি যেমন সাধাসিধে মানুষ ছিলেন, তেমনই রইলেন। ত্রিপুরাবাসীর অন্তরে চিরকালের জন্য তাঁর স্থান রইল।

সত্যের জয়

[মানুষের শ্রেষ্ঠ ধর্ম হল সত্য। যে মানুষ সত্যাশ্রয়ী তার জয় অনিবার্য। সত্যাশ্রয়ী মানুষের আত্মবিশ্বাস বাড়ে, সে সত্যের জন্য নিজের জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিতে পারে। প্রচলিত এক কাহিনীর মাধ্যমে বিবেকানন্দ এই কথাই বোঝাতে চাইলেন তাঁর অনুগামীদের।]

বর্ধমান নগরে রূপসেন নামে এক প্রভাবশালী রাজা ছিলেন। রাজা নিজে ছিলেন গুণী, তাই তাঁর রাজসভায় গুণী মানুষদের বিশেষ সমাদর ছিল। দেশবিদেশের গুণী মানুষরা তাঁর রাজসভা অলঙ্কৃত করতেন।

রাজা রূপসেনের সুখ্যাতি শুনে বীরভদ্র নামে দক্ষিণ দেশের এক রাজপুত্র একদিন এলেন বর্ধমান নগরে। এসেই রক্ষীকে বললেন, তিনি রাজার সঙ্গে দেখা করতে চান।

রক্ষী রাজাকে গিয়ে জানাল বীরভদ্রের কথা। রাজা তখুনি তাঁকে রাজসভায় নিয়ে আসার আদেশ দিলেন।

বীরভদ্র সভায় এলে রাজা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—বলুন, কি কারণে আপনি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চেয়েছেন।

বীরভদ্র বললেন—আমি কর্মপ্রার্থী, আপনার কাছে একটি উপযুক্ত কাজ চাই।

বীরভদ্রকে দেখে রাজার খুব পছন্দ হয়েছিল। সুপুরুষ, চোখেমুখে একটা আত্মপ্রত্যয়ের ছাপ, দেখলেই বোঝা যায় এমন মানুষ অসাধারণ কাজ করতে পারেন। রাজা তাই হাসিমুখে জিজ্ঞেস করলেন—কি ধরনের কাজ আপনি চান?

বীরভদ্র বললেন—আমার কাজের ব্যাপারে কোন ছুৎমার্গ নেই মহারাজ, আমি যে কোন কাজ করতে রাজি।

—কত বেতন পেলে আপনি খুশী হবেন? রাজা পরের প্রশ্নটি করেন।

বীরভদ্র খুব সহজভাবে বললেন—প্রতিদিন এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা বেতন পেলে আমি কাজ করতে পারি মহারাজ।

এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা প্রতিদিনের বেতন? শুনে রাজা তো রীতিমত অবাক। লোকটা বলে কি?

কিন্তু রাজা নিজের অবাক হওয়ার ভাবটা মোটেই প্রকাশ করলেন না। ভাবলেন, কোন মন্তব্য বা সিদ্ধান্ত করার আগে তাঁর উচিত, বীরভদ্র সম্পর্কে সব কিছু জেনে নেওয়া। সত্যিই অত অর্থ তার প্রতিদিন প্রয়োজন কিনা।

রাজা জিজ্ঞেস করলেন—আপনার সংসারে লোক কজন?

বীরভদ্র খুব শান্ত ভাবে বললেন—চার জন। একটি পুত্র, একটি কন্যা, স্ত্রী এবং আমি।

রাজা এবার সত্যিই অবাক হলেন। ঘরে লোক এত কম, অথচ লোকটা এত টাকা বেতন চাইছে! এ তো রাজকোষের অর্থের অপব্যয় হবে। আবার ভাবলেন, নিশ্চয় বীরভদ্র বিশেষ কোন গুণের অধিকারী, হয়ত সেজন্যই সে এত অর্থ দাবি করছে।

রাজা সে কথা জিজ্ঞেসও করলেন। বললেন বীরভদ্র, আপনার কি এমন বিশেষ যোগ্যতা আছে, যে কারণে আপনি এত টাকা বেতন চাইছেন?

বীরভদ্র বললেন—রাজা, আমার কি গুণ আছে জানি না, তবে আমি নিজে সত্যনিষ্ঠ ও ধর্মনিষ্ঠ মানুষ। সত্য ও ধর্ম রক্ষার জন্য এবং আপনার প্রয়োজনে আমি নিজের প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে পারি।

চমকিত রাজা বললেন—প্রাণ দিতে পারেন?

বীরভদ্র বললেন—হ্যাঁ মহারাজ। আপনার কাছ থেকে বেতন নিলে আমি আপনার কর্মচারীতে পরিণত হব। কর্মচারীর কাজ হল প্রভুর অনিষ্ট না করা, তাঁর যাতে কোন অনিষ্ট না হয় তা দেখা এবং

তাঁর মঙ্গলের জন্য নিজের জীবনেরও পরোয়া না করা। এই তিনটি কাজই আমি করব।

রাজার কর্মচারীর সংখ্যা প্রচুর, জীবনে বহু লোককে তিনি কাজে নিয়োগ করেছেন, কিন্তু কোনদিন কারুর মুখ থেকে এমন দৃঢ়তাব্যঞ্জক কথা শোনেন নি। বীরভদ্রের উত্তর শুনে তিনি খুব খুশি হলেন। ভাবলেন, দেখাই যাক না একে কাজে নিয়ে। যদি বীরভদ্র নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করতে না পারেন, তাহলে তাঁকে কাজ থেকে ছাড়িয়ে দেবেন।

রাজা বললেন—আপনার কথায় আমি খুশি হয়েছি বীরভদ্র। আপনাকে প্রতিদিন এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা বেতনে কাজে নিয়োগ করা হল। আপনার কাজ হল আমার রাজ্যের যাতে মঙ্গল হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা।

বীরভদ্র রাজাকে ধন্যবাদ জানিয়ে কাজে যোগ দিলেন।

প্রতিদিন সকালে রাজপ্রাসাদে চলে আসতেন বীরভদ্র, আর ফিরে যেতেন সন্ধ্যার সময়। রাজা খাজাঞ্চিকে বলেই রেখেছিলেন, তিনি প্রতিদিন ওঁর কাজ শেষ হবার পর ওঁর হাতে হাজার স্বর্ণমুদ্রা তুলে দিতেন।

বীরভদ্র কিন্তু পুরো অর্থ বাড়িতে নিয়ে যেতেন না। প্রাপ্ত স্বর্ণমুদ্রার অর্ধেক তিনি দিয়ে দিতেন বৈষ্ণব, বৈরাগী ও সাধুসন্তদের, আর বাকি অর্থ ব্যয় করতেন স্ত্রী-পুত্র-কন্যার ভরণপোষণ ও নিজের জীবনধারণের জন্য।

এভাবে দিন যায়। বীরভদ্রের আচরণে খুবই তুষ্ট রাজা, তাই তাঁকে সব সময় নিজের কাছেই রেখে দেন।

একদিন প্রায় সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। অন্যান্য দিনের মত বীরভদ্র বসে আছেন রাজার কাছে। হঠাৎ কিছু দূরে এক মহিলার কান্নার আওয়াজ শোনা গেল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন।

রাজা একটু অবাকই হয়েছিলেন। এই ভর সন্ধ্যের সময় রাজ-প্রাসাদের মধ্যে কোন্ মহিলা কাঁদছেন?

বীরভদ্রকে জিজ্ঞেস করলেন রাজা—কে কাঁদছে বলুন তো ?

বীরভদ্র মাথা নাড়লেন—ঠিক বুঝতে পারছি না মহারাজ।

রাজা বললেন—মনে হচ্ছে দক্ষিণ দিক থেকে কান্নার আওয়াজটা ভেসে আসছে। আপনি ওখানে গিয়ে দেখুন ব্যাপারটা কি। এর কারণ আমাকে জানিয়ে যাবেন।

বীরভদ্র মাথা নেড়ে আজ্ঞা পালনের জন্য এগিয়ে গেলেন।

তিনি চলে যাবার পরেই রাজার মনে হল, বীরভদ্রকে একা ছেড়ে দিয়ে তিনি ভালো করেন নি। রাজপ্রাসাদের দক্ষিণ দিকটা অপেক্ষাকৃত ফাঁকা, কেউই থাকেন না ওখানে। অমন নির্জন জায়গায় রাতের অন্ধকারে ওঁকে একা পাঠানো উচিত নয় মনে করে রাজা স্থির করলেন, তিনিও ওঁকে অনুসরণ করবেন। আড়ালে থেকে দেখবেন, ব্যাপারটা কি এবং বীরভদ্রই বা কেমন প্রকৃতির মানুষ।

এই ভেবে রাজা সত্যিই বীরভদ্রকে অনুসরণ করলেন।

এদিকে বীরভদ্র ঐ কান্নার স্বর অনুসরণ করে একটা নির্জন জায়গায় এসে পৌঁছুলেন। দেখলেন, তাঁদের অনুমান মিথ্যে নয়, সত্যিই এক রমণী কাঁদছেন।

মহিলার বয়স খুব একটা বেশি নয়। দেখতেও অপরূপ সুন্দরী। সঙ্গী-সাথী কেউ নেই, রয়েছেন একা এই নির্জন জায়গায়। বীরভদ্র ভেবেই পেলেন না এমন এক সুন্দরী মহিলার কান্নার কারণ কি হতে পারে।

মহিলার একেবারে সামনে এগিয়ে গিয়ে তাই বীরভদ্র জিজ্ঞেস করলেন—মা, তুমি কে ? এখানে একা একা বসে এভাবে কাঁদছ কেন ?

বীরভদ্রর দিকে অশ্রুভেজা চোখে তাকালেন মহিলা। কান্না-ভেজা গলায় বললেন—আমি এই রাজপ্রাসাদের গৃহলক্ষ্মী। আমার অনুগ্রহেই রাজা রূপসেন তাঁর রাজ্য, ধনসম্পদ ও সুখসমৃদ্ধি ভোগ করছেন। এতকাল আমি এই বাড়িতে আনন্দে ছিলাম। কিন্তু

এখন এখানে নানা অন্যায় ও পাপ এসেছে, রাজা নিজেও ধর্মের নামে নানা অধর্ম করছেন। আমি সত্যনিষ্ঠ নারী, অন্যায় ও অধর্ম সহ্য করতে পারি না। তাই এ বাড়িতে থাকা আমার পক্ষে আর সম্ভব নয়। আজই গৃহত্যাগ করতে হবে আমায়। কিন্তু রাজা রূপসেনকে আমি সত্যিই খুব ভালবাসি। আমি জানি, আমি এখান থেকে চলে গেলে শুধু তিনি ধনসম্পদ ও রাজ্যই হারাবেন না, তাঁর মৃত্যুও হবে। সেই কথা ভেবেই আমি এমন কাতরভাবে কাঁদছি।

সব শুনে বীরভদ্রের উজ্জ্বল মুখখানা মলিন হয়ে গেল। যে রাজা তাকে এতদিন এত টাকা বেতন দিয়েছেন, সেই রাজার সমূহ বিপদ উপস্থিত। এই মহিলা এই বাড়ি ছেড়ে চলে গেলে তিনি শুধু রাজ্যই হারাবেন না, তাঁর প্রাণও যাবে।

আকুল হয়ে উঠলেন বীরভদ্র রাজার কথা ভেবে। গৃহলক্ষ্মীর সামনে দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে বললেন—মা, আমি রূপসেনের কর্মচারী মাত্র। কিন্তু প্রভুর পরিণতির কথা ভেবে নিদারুণ মনোকষ্ট অনুভব করছি। এমন কি কোন উপায় নেই মা, যাতে রাজাকে এই বিপদ থেকে রক্ষা করা যায়?

গৃহলক্ষ্মী বললেন—আছে, একটি উপায় আছে। কিন্তু সে কাজ খুবই শক্ত। আমার তো মনে হয় না কেউ তেমন করে রাজাকে উদ্ধার করতে এগিয়ে আসবেন।

বীরভদ্র তেমনি হাত জোড় করে বললেন—আপনি বলুন মা। আমি রাজার কাছে কৃতজ্ঞ। তাই কাজটি যতই কঠিন হোক আমি তা করে রাজাকে বিপদমুক্ত করার চেষ্টা করব।

গৃহলক্ষ্মী বললো—এই রাজপ্রাসাদের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে একটি পুকুর আছে। যেখানে দেবী কাত্যায়নীর একটি মন্দির আছে। ঐ দেবী জাগ্রত, তিনিই রাজাকে যাবতীয় বিপদ আপদ থেকে রক্ষা করেন। ঘটনাক্রমে ঐ দেবীও আমারই মত তোমাদের রাজার উপরে

ক্রুদ্ধা হয়ে উঠছেন। তাঁর ক্রোধের যাতে নিবারণ হয় সেই চেষ্টাই তোমাকে করতে হবে।

বীরভদ্র জিজ্ঞেস করলেন—কি করলে তাঁর ক্রোধ নিবারিত হবে মা?

দেবী বললেন—কেউ যদি শুদ্ধভাবে ঐ দেবীর পূজা করে নিজের হাতে নিজ সন্তানকে বলি দিতে পারে, তাহলে তিনি শান্ত হবেন। তিনি শান্ত হলে আমিও এ বাড়িতে থাকতে পারব। তুমি কি তা করতে পারবে?

একটুও না ভেবে বীরভদ্র তখুনি জবাব দিলেন—পারব। আমি রাজার জন্য শুধু আমার পুত্রের কেন, নিজের জীবনও ত্যাগ করতে পারি। আমি এখুনি বাড়িতে গিয়ে নিজের ছেলেকে নিয়ে আসছি, আপনি অনুগ্রহ করে দেবী কাত্যায়নীকে প্রসন্ন না করা পর্যন্ত এ বাড়িতে থাকুন।

গৃহলক্ষ্মী বললেন—বেশ, তাই হবে।

বলেই তিনি অন্তর্হিতা হলেন।

বীরভদ্র আর একটি মুহূর্ত সময় নষ্ট করলেন না। তখুনি নিজের বাড়ির দিকে রওনা হলেন।

রাজা এতক্ষণ একটি বটগাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে বীরভদ্র ও গৃহলক্ষ্মীর সব কথা শুনেছিলেন। গৃহলক্ষ্মীর কথা শুনে তাঁর বুক কেঁপে উঠল। এ কি কথা দেবী? কোন মানুষের পক্ষে কি তার ছেলেকে নিজের হাতে বলি দেওয়া সম্ভব? রাজাকে যদি এমন কথা দেবী বলতেন, রাজা সে আদেশ পালন করতে পারতেন না কিন্তু বীরভদ্র তো এতটুকু না ভেবে দেবীর কথায় সম্মতি জানালেন। সত্যিই কি বীরভদ্র দেবী কাত্যায়নীর সামনে নিজের হাতে ছেলেকে বলি দেবেন? বাড়ি গিয়ে তিনি নিজের স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে কি বলবেন, তা জানার জন্য খুব কৌতূহল হল রাজার। তিনি বীরভদ্রকে গোপনে অনুসরণ করলেন।

বাড়ি এসে বীরভদ্র নিজের স্ত্রীকে সব ঘটনা বললেন। বীরভদ্রের স্ত্রীও তেমন মহিলা। সব শুনে তিনি এতটুকু দুঃখিত হলেন না, বরং ঘুমন্ত ছেলের ঘুম ভাঙ্গিয়ে বললেন—বাবা, তুমি সত্যিই পুণ্যবান। দেবী কাত্যায়নী তোমার বাবাকে বলেছেন, তোমার মস্তক দান করলে তিনি প্রসন্না হবেন। রাজার ধনসম্পদ তাতে অটুট থাকবে এবং তিনি দীর্ঘজীবী হবেন।

বীরভদ্রের দশ বছরের ছেলে অমন কথা শুনে এতটুকু ভয় পেল না। পিতাকে বললে—তুমি রাজার কাছে কৃতজ্ঞ, বাবা। দেবীকে আমার মস্তক দান করলে যদি রাজ-ঋণের খানিকটাও শোধ হয়, তাহলে তাই করো তুমি।

ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে বীরভদ্রের স্ত্রী ও পুত্রের এমন কথা শুনে রাজা নিজের মনেই ধন্য ধন্য করে উঠলেন।

কিন্তু ঘটনার তখনও অনেক বাকি। রাজা ততক্ষণে স্থির করে ফেলেছেন, এর শেষ না দেখে তিনি রাজপ্রাসাদে ফিরে যাবেন না।

এরপর বীরভদ্র সপরিবারে মন্দিরে এলেন। তখন রাত্রি বেশ গাঢ় হয়েছে।

মন্দিরের পার্শ্ববর্তী পুকুরে তাঁরা সকলেই স্নান সেরে শুদ্ধ হয়ে নিলেন। তারপর মন্দিরে গিয়ে বীরভদ্র নিজের হাতে ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য সাজিয়ে দেবী কাত্যায়নীর পুজো সারলেন। তারপর ছেলেকে নিয়ে এলেন দেবীর সামনে। এক হাতে খড়্গ নিয়ে দেবীকে প্রণাম করে বললেন—দেবী, প্রসন্না হও। আমাদের রাজার মঙ্গল কর।

কথা শেষ হতেই বীরভদ্রের হাতের খড়্গ নেমে এল তাঁরই পুত্রের গলার উপর।

ধড় থেকে গলা আলাদা হয়ে গেল। রক্তে ভেসে গেল গোটা মন্দির।

বীরভদ্রের কন্যা তার প্রিয় ভাইয়ের এমন মৃত্যু সহ্য করতে পারল না। বাবা-মার সঙ্গে মন্দিরে আসার সময় সে হাতে করে বিষ নিয়ে

এসেছিল। তখুনি সেই বিষ সে গলাধঃকরণ করল। আর সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল।

চোখের সামনে নিজের প্রাণাধিক প্রিয় পুত্র ও কন্যার মৃত্যু সইতে পারলেন না বীরভদ্রের স্ত্রী। কন্যার হাত থেকে বিষ নিয়ে তখুনি তা খেয়ে তিনি স্বেচ্ছামৃত্যু বরণ করলেন।

এরপর বেঁচে থাকা অর্থহীন মনে করে বীরভদ্র নিজেই খড়্গের আঘাতে নিজের মস্তককে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেললেন।

সত্যনিষ্ঠ চারটি মানুষের মৃতদেহ মন্দিরে পড়ে থাকতে দেখে রাজা আর স্থির থাকতে পারলেন না। এতক্ষণ নীরবে সব ঘটনা চোখের সামনে দেখেছেন তিনি। ভাবছিলেন, বীরভদ্র তাঁর সার্থক কর্মচারী। নিজের জন্য নয়, রাজার মঙ্গলের জন্য স্ত্রী-পুত্র-কন্যাসহ এভাবে আত্মাহুতি দিতেও যাঁর একবারের জন্যও ইতস্তত হল না, তাঁকে মাত্র এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা বেতন হিসেবে দিয়ে অন্যায় কাজই করেছেন তিনি। এমন সত্যনিষ্ঠ, বীর মানুষকে গোটা রাজ্য দিলেও বোধ করি কিছুই দেওয়া হয় না।

একটা দুর্বার অনুশোচনা রাজার মনকে ছেয়ে ফেলল।

বীরভদ্র ও তাঁর পরিবারের সবাই তাঁর জন্য প্রাণ দিল, আর তিনি শুধু দেখলেন। তাদের কৃত কর্মের উপকারটুকু শুধু ভোগ করবেন রাজা? রাজার মনে হল, এর পর তাঁরও আর বেঁচে থাকার অধিকার নেই। বীরভদ্র যেমন দেবী কাত্যায়নীর সামনে আত্মাহুতি দিয়ে সত্যনিষ্ঠার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, তিনিও তেমনি নিজের প্রাণ দিয়ে দেবীকে দেখাবেন, কর্মচারীর মর্যাদা রক্ষা করতে তিনি কুণ্ঠিত নন। এতজনের প্রাণের বিনিময়ে তিনি নিজের প্রাণ চান না।

এই ভেবে মৃত বীরভদ্রের হাত থেকে খড়্গটা নিয়ে রাজা 'জয় মা' বলে যেই নিজের গলায় কোপ বসাতে যাবেন, অমনি আবির্ভূতা হলেন দেবী কাত্যায়নী। রাজার হাতের খড়্গ চেপে ধরে তিনি বললেন—বৎস, আমি তোমার উপর প্রসন্ন হয়েছি। এখন তুমি বল, তুমি কি বর চাও।

রাজা হাতজোড় করে বললেন—দেবী সত্যিই যদি আপনি আমার উপর প্রসন্ন হয়ে থাকেন, তাহলে বীরভদ্র ও তাঁর স্ত্রী-পুত্র-কন্যার জীবন ফিরিয়ে দিন।

দেবী বললেন—তুমি নিজের জন্য কিছু চাও না?

রাজা বললেন—না দেবী। বীরভদ্র ও তাঁর পরিবারের লোকেরা আমার মঙ্গলের জন্য প্রাণ দিয়েছেন। অন্যের প্রাণের বিনিময়ে আমি নিজের উপকার চাই না। তার চেয়ে আমার মৃত্যু ভালো।

দেবী বললেন—রূপসেন, তুমি যথার্থই রাজা। কর্মচারীর প্রতি এত প্রীতি দেখে আমি সত্যিই খুশি হয়েছি। আমার আশীর্বাদে মৃত বীরভদ্র ও তাঁর স্ত্রী-পুত্র-কন্যা এখুনি প্রাণ ফিরে পাবে।

সত্যিই তাই হল। মুহূর্তের মধ্যে ওঁরা চারজন বেঁচে উঠলেন।

সামনে রাজাকে দেখে বীরভদ্র লজ্জা পেলেন। রাজা কি তাহলে সব কিছুই দেখেছেন নাকি? কুণ্ঠিতভাবে বললেন—রাজা, আপনি এখানে?

বীরভদ্রকে আলিঙ্গন করে রাজা বললেন—আপনাকে আমি এতদিন চিনতে পারি নি, সেজন্য আমায় ক্ষমা করুন।

শ্রেষ্ঠ দান

[দান মানুষের শ্রেষ্ঠ ধর্ম। দানের মূল্য কি, তার স্বরূপ কেমন, তা বোঝাতে গিয়ে বিবেকানন্দ তাঁর অনুগামীদের মহাভারতের এই গল্পটি বললেন।]

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর পাণ্ডবরা একটা যজ্ঞ করলেন। সুবিশাল তার আয়োজন আর জাঁকজমক। যজ্ঞ যিনি দেখলেন, তিনিই স্বীকার করলেন, এমন বিরাট যজ্ঞ এর আগে কখনও হয় নি।

যজ্ঞ শেষ হবার পর দানের আয়োজন করলেন পাণ্ডব ভ্রাতা। শত শত ব্রাহ্মণকে মহার্ঘ বস্ত্রাদি দান করা হল। সাধারণ মানুষও বাদ গেল না। তারাও যজ্ঞস্থলে পৌঁছে দান গ্রহণ করল। সকলেই স্বীকার করল, এমন দানোৎসব এর আগে কেউ কখনও দেখে নি।

প্রশংসার উপরে প্রশংসা শুনে পাণ্ডব ভ্রাতাদের মুখচোখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। এমন দান বা যজ্ঞ এর আগে কখনও হয় নি, এমন কথা বারবার শুনতে শুনতে তাঁদের মনে একটা গর্বের ভাব দেখা দিল।

যজ্ঞ শেষ হয়ে গেল। দানপর্বও মিটে গেছে। আয়োজক পাণ্ডব ভ্রাতারা এবং তাঁদের অনুচররা নিজেদের মধ্যে যজ্ঞ নিয়ে আলোচনা করছেন, এমন সময় যজ্ঞস্থলে এক ক্ষুদ্রাকায় নকুল (বেজি) এসে হাজির। এত বড় যজ্ঞস্থলে ঐ সামান্য জীব কোনই সাড়া ফেলতে পারত না, কিন্তু নকুলটির বিশেষ চেহারা এবং আচরণ সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

সকলে তাকিয়ে দেখলেন, নকুলটির অর্ধেক শরীর সোনার, বাকি অর্ধেক স্বাভাবিক পিঙ্গলবর্ণের, আশ্চর্য হলেন সকলেই, নকুলটির শরীর এভাবে সোনার হয়ে গেল কি করে? কিন্তু কেউই নকুলটিকে সেই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার সুযোগ পেলেন না, কারণ নকুলটি এসেই যজ্ঞ-ভূমির মাটিতে গড়াগড়ি দিতে শুরু করল।

সকলেই আশ্চর্য হয়ে নকুলটির কাণ্ড দেখতে লাগল।

এক সময় নকুল গড়াগড়ি দেওয়া বন্ধ করে চারদিকের লোকদের দিকে তাকিয়ে বলল—তোমরা সকলেই বলছ, এমন যজ্ঞ এর আগে তোমরা দেখ নি। কিন্তু আমি বলছি, তোমরা মিথ্যাবাদী, এটা যজ্ঞই নয়।

সবাই হাঁ হাঁ করে উঠল, বলল—কি বলছ তুমি। তুমি কি জান, এই যজ্ঞকে সার্থক করার জন্য পাণ্ডব ভ্রাতারা কত চেষ্টা করেছেন? যজ্ঞের আয়োজন করেছেন তাঁরা নিখুঁতভাবে, যজ্ঞ সম্পাদনে এতটুকু খুঁত রাখেন নি, নিষ্ঠাভরে যজ্ঞের প্রতিটি আচার-আচরণ সম্পন্ন করেছেন। তারপরে অকাতরে দান করেছেন। রাজ্যের প্রতিটি সাধারণ মানুষ তাতে উপকৃত হয়েছে। সকলেই তাই ধন্য ধন্য করছে।

নকুল বলল—জানি। এখানে আসার আগেই লোকমুখে আমি তা শুনেছি। কিন্তু গরীব মানুষদের কিছু টাকাপয়সা, দিলেই তা শ্রেষ্ঠ দান হয় না। পাণ্ডবদের অনেক আছে, তাঁরা তা থেকে অংশবিশেষ আপনাদের দিয়েছেন। এমন নয় যে নিজেদের জন্য কিছুই না রেখে আপনাদের সব কিছু বিলিয়ে দিয়েছেন। সেজন্যই বলছি, এই দান শ্রেষ্ঠ দানে পরিণত হতে পারে নি।

সামান্য এক প্রাণীর মুখ থেকে এমন যুক্তিপূর্ণ কথা শুনে উপস্থিত সকলেই অবাক হয়ে গেল।

একজন সাহস করে জিজ্ঞেস করল—নিজের কথা না ভেবে পরের জন্য সর্বস্ব বিলিয়ে দেওয়ার দৃষ্টান্ত কি তোমার নজরে পড়েছে?

নকুল বলল—পড়েছে, সেজন্যই তো এই যজ্ঞসভার দানকে আমি শ্রেষ্ঠ দান হিসেবে অভিহিত করতে পারছি না।

সকলেই নকুলের দেখা শ্রেষ্ঠ দানের ঘটনাটি শুনতে চাহিল।

নকুল বলতে শুরু করল—

এক গ্রামে বাস করতেন এক গরীব ব্রাহ্মণ। স্ত্রী, পুত্র আর

পুত্রবধূকে নিয়ে চারজনের সংসার তার। কিন্তু ব্রাহ্মণ এই ছোট সংসার চালাতেও হিমসিম খেয়ে যেত, কারণ ব্রাহ্মণ কখনও অধর্ম করত না, মানুষকে ধর্মকথা শোনাতো সে, খুশি হয়ে তাঁকে যে যা ভিক্ষা দিত, তাই নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতেন তিনি। অন্য কোন কাজ ব্রাহ্মণ করতেন না, তাই অভাব ছিল তাঁর নিত্য সঙ্গী।

কিন্তু ব্রাহ্মণের একটা বড় গুণ ছিল। অভাব তিনি একেবারেই গায়ে মাখতেন না। শুধু তিনি কেন, তার পরিবারের অন্য তিন জনেরও স্বভাব ছিল একই রকম। কেউ দেখে বুঝত না, ওঁদের ঘরে এত অভাব রয়েছে। সব সময়েই চারজনের মুখে হাসি লেগে থাকত।

এর মধ্যেই ঘটল একটা অঘটন।

হঠাৎ ঐ দেশে দেখা দিল দুর্ভিক্ষ। এক বছর নয়, দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া পর পর তিন বছর গ্রাস করল সেই দেশের প্রতিটি শহর ও গ্রামকে। হাহাকার উঠল মানুষের মধ্যে।

ব্রাহ্মণ-পরিবারের অবস্থা হল আরও খারাপ।

দেশের লোকই যেখানে বুভুক্ষু, সেখানে কে তাদের ভিক্ষা দেবে? ব্রাহ্মণের সংসারে কষ্ট তাই অনেক বেড়ে গেল। প্রথমে একবেলা কোনক্রমে আহার জুটত, কালক্রমে তাও বন্ধ হয়ে গেল। ব্রাহ্মণ পরিবারের ভাগ্যে জুটতে লাগল উপবাস।

এমনই একটা সময়ে পর পর তিন দিন উপবাসে কাটাতে হল ওদের। খিদের জ্বালা সইতে না পেরে ব্রাহ্মণ চতুর্থ দিন বহু দূরে গেলেন ভিক্ষার খোঁজে। ভাগ্য একটু প্রসন্ন ছিল, তাই দিনের শেষে ব্রাহ্মণ একজনের বাড়ি থেকে কিছু যবের ছাতু পেলেন।

যা পেয়েছিলেন তাতে একজনের কোনক্রমে পেট ভরে, কিন্তু একা তো আর খাওয়া যায় না, পরিবারে মানুষ চারজন। ব্রাহ্মণ ঠিক করলেন, যা ভিক্ষা পেয়েছেন তাকে চারটি ভাগ করে প্রত্যেকে তা খাবেন।

বাড়ি এসে সেইরকম ব্যবস্থাই করলেন ব্রাহ্মণ।

স্নান সেরে চারজনই একসঙ্গে খেতে বসলেন। তিনদিন ধরে উপবাসী রয়েছেন সবাই, ব্রাহ্মণ তাই খাওয়া শুরু করতে বললেন।

ঠিক সেই সময় দরজায় করাঘাত শোনা গেল।

—কে ? ব্রাহ্মণ জিজ্ঞেস করলেন।

ছোট্ট উত্তর এল—আমি। দরজাটা একটু খোল।

ব্রাহ্মণ উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিলেন।

কঙ্কালসার চেহারার একটি মাঝবয়সী মানুষ। খালি গা। চক্ষু কোটরাগত। হাতে একটা লাঠি, কিন্তু সেটিও শক্ত করে ধরতে পারছে না, দেখেই বোঝা যায়, দুর্বল শরীর।

লোকটি হাঁফাচ্ছিল। যেন এখুনি বসে পড়তে পারলে ভাল হয়। কোনরকমে লাঠিটি ধরে ব্রাহ্মণের দিকে তাকিয়ে বলল—তিন দিন খাই নি, আমি বড় ক্ষুধার্ত বাবা।

ব্রাহ্মণ আগন্তুকের দিকে তাকালেন। একবার মনে হল, হে ধরিত্রী, দ্বিধা হও! এক ক্ষুধার্তকে আর এক ক্ষুধার্ত বলছে—আমি ক্ষুধার্ত! ঈশ্বর, এ কি লীলা তোমার ?

আগন্তুকের জন্য দুঃখে পরিপূর্ণ হয়ে গেল ব্রাহ্মণের হৃদয়। নিজের উপবাস-কষ্টের কথা তাঁর আর মনেই রইল না। অতিথি নারায়ণ। তাই আগন্তুককে বললেন—আসুন, আপনি ভেতরে আসুন।

পরম সমাদরে অতিথিকে আসন পেতে দিলেন তিনি। তারপর নিজের ভাগের খাবারটুকু তাঁর সামনে দিয়ে বললেন—এই সামান্য খাদ্যটুকু আপনি গ্রহণ করলে আমি কৃতার্থ হব।

আগন্তুক তো এমনিতেই ছিল ক্ষুধার্ত। ঐটুকু ছাতু খেয়ে নিতে তার মুহূর্তমাত্র সময় লাগল। তারপর এমনভাবে সে ব্রাহ্মণের মুখের দিকে চাইল যে ব্রাহ্মণ বুঝে নিলেন, তিনি আরও খাবার চান।

ঘরের ভেতরে ঢুকে ব্রাহ্মণ স্ত্রীকে জানালেন সে কথা। অতিথি এসে পড়ায় ওঁরা কেউই তখনও খান নি, ব্রাহ্মণের জন্য অপেক্ষা করছিলেন।

সব শুনে ব্রাহ্মণের স্ত্রী বললেন—তুমি আমার ভাগের ছাতুটুকু আগন্তককে দাও।

ব্রাহ্মণ বললেন—কিন্তু তুমি তো গত তিনদিন ধরে উপবাসী রয়েছ।

ব্রাহ্মণী বললেন—তা ঠিক, কিন্তু ক্ষুধার্ত অতিথিকে খেতে না দিয়ে নিজে খাব, এমন পাষণ্ড আমি নই। তুমি আমার ভাগের খাবারটুকু ওঁকে দাও, ওঁর মুখের হাসিতেই আমার পেট ভরে যাবে।

ব্রাহ্মণ আর কি করেন, স্ত্রীর ভাগের খাবারটুকুও অতিথিকে দিলেন। অতিথি মুহূর্তে তা শেষ করে বলে উঠল—বড় ক্ষিধে, আরও খাবার পেলে ভালো হয়।

আগন্তুকের কথা শুনতে পেয়েছিল ব্রাহ্মণের পুত্র। সে নিজেই তার ভাগের খাবারটুকু এনে অতিথির পাতে দিল।

অতিথি সেটুকুও খেয়ে নিয়ে বলল—আর একটু পেলেই পুরো পেট ভরত। খুব তৃপ্তি পেতাম।

এবার এগিয়ে এল ব্রাহ্মণের পুত্রবধূ। সে তার ভাগের ছাতুটুকু অতিথির পাতে দিল।

অতিথি সেটুকু খেয়ে পরিতৃপ্তির উদগার তুললেন। ব্রাহ্মণকে বললেন—বাবা, আপনাদের বাড়িতে খেয়ে তৃপ্ত হলাম। ঈশ্বর আপনাদের মঙ্গল করুন।

এদিকে বহু কষ্টে সংগ্রহ করে আনা ছাতুটুকু খেয়ে যাওয়ায় ব্রাহ্মণ পরিবারের চারজনকেই দারুণ কষ্ট সহ্য করতে হল। কিন্তু ওঁরা হাসিমুখে সেই কষ্ট মেনে নিলেন। এমন কি, একবারও নিজেদের অদ্ভুত দানের কথা কাউকে বললেন না।

এই পর্যন্ত বলে নকুল বলল—এর পরের অংশটুকু সত্যিই আরও আশ্চর্যের।

অতিথি যেখানে বসে ছাতু খেয়েছিলেন, সেখানের মেঝেতে ছাতুর খানিক গুঁড়ো পড়েছিল। আমি না জেনে ওখানে খানিক সময়

গড়াগড়ি দিয়েছিলাম। গড়াগড়ি থামাতে দেখি, আমার শরীরের অর্ধেকটা সোনা হয়ে গেছে। সেই থেকে আমি সোনার শরীর নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি, আপনারাও তা দেখছেন।

অদ্ভুত ঐ দানের কথা শুনে কারুর মুখ থেকেই কোন আওয়াজ বেরোচ্ছিল না। সত্যিই এমন দানের তুলনা নেই। নিজের মুখের গ্রাস অন্যকে তুলে দেওয়া সহজ কাজ নয়। নিজে না খেয়ে অন্যকে যিনি খাওয়ান, তিনিই সার্থক মানুষ।

নকুল বলল—এজন্যই আমি আপনাদের বলেছিলাম, এই যজ্ঞ-শালার দান দানই নয়। শ্রেষ্ঠ দানের যে নমুনা আমি দেখেছি, তার ধারে কাছেও এই দান পৌঁছতে পারে না।

যজ্ঞস্থল নিস্তব্ধ হয়ে রইল। নকুল ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল।

জ্ঞানোদয়

[ভারতীয় নারীর কাছে পতি পরম গুরু। পতিসেবা করা, সুখে-দুঃখে স্বামীর সঙ্গে থাকাই পতিব্রতা নারীর চরম লক্ষ্য। যুগ যুগ ধরে ভারতীয় নারীরা পতিসেবার অপূর্ব দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। এমনই একটি পতিব্রতা নারীর গল্প অনুরাগীদের শোনালেন বিবেকানন্দ।]

বিক্রমসিংহ ছিল রাজার ছেলে। সার্থকনামা পুরুষ। শৌর্যবীর্যে যেমন অসাধারণ, তেমনি প্রজাদেরও প্রিয়পাত্র। ছেলে উপযুক্ত হওয়ায় রাজাও খুশি। বিক্রম বাইশ বছর বয়সে পা দিলে রাজা তাঁকে যুবরাজ পদে অভিষিক্ত করলেন।

রাজা ঠিকই করে ফেলেছিলেন, খুব বেশি দিন তিনি রাজত্ব করবেন না। বিক্রমের হাতেই রাজ্যভার অর্পণ করে বানপ্রস্থ অবলম্বন করে বনে যাবেন, বাকি জীবনটা ঈশ্বরের আরাধনাতেই কাটিয়ে দেবেন। তার আগে করণীয় কাজগুলি তাঁকে করে যেতে হবে। বিক্রমের বিয়ে দেওয়াও একটা জরুরী কাজ। সে কাজটাও সেরে ফেললেন তিনি, পাশের দেশের রাজার মেয়ে অনুরাধার সঙ্গে বিক্রমের বিয়ে দিলেন।

অনুরাধা ছিলেন যেমন সুন্দরী, তেমনি পতিব্রতা। অমন পতিব্রতা নারী খুব একটা দেখা যায় না। রাজা তা লক্ষ্য করে আরও খুশি হলেন। ভাবলেন, তাঁর ছেলে নিশ্চয়ই খুব সুখী হবে।

অনুরাধাকে স্ত্রী হিসেবে পেয়ে বিক্রমও খুব খুশি হয়েছিল।

কিন্তু মানুষের জীবনে সুখ বড় ক্ষণস্থায়ী। অচিরে বিক্রমের জীবনে দুঃখের ছায়া নেমে এল। বিক্রম কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হলেন। অমন সুন্দর শরীরটা দুরারোগ্য নিষ্ঠুর ব্যাধির কবলে পড়ে ধীরে ধীরে বিকৃত হয়ে যেতে লাগল। পুত্রকে রোগমুক্ত করার জন্য রাজা দেশ বিদেশ থেকে কত বৈদ্যকে আনালেন, তাঁরা কত রকমের ওষুধ

দিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। নিয়তির নিষ্ঠুর বিধানে বিক্রমের দেহ কুষ্ঠরোগে আরও জর্জরিত হয়ে উঠল।

এহেন দুরারোগ্য ব্যাধি নিয়ে দশজনের মধ্যে থাকা উচিত নয় মনে করে বিক্রম রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করে অরণ্যের নির্জন স্থানে চলে যাবেন বলে ঠিক করলেন। রাজামশাই প্রথমদিকে পুত্রের এই প্রস্তাবে সায় দেন নি, কিন্তু বিক্রমের প্রবল ইচ্ছায় শেষ পর্যন্ত তাঁর বনগমনে সম্মতি দিলেন।

বিক্রম ঠিক করেছিলেন, একাই যাবেন। কিন্তু বাদ সাধলেন অনুরাধা। বিক্রমের শত অনুরোধেও তিনি রাজপ্রাসাদে থাকতে রাজি হলেন না। বললেন—আমি তোমার স্ত্রী। স্ত্রীর কর্তব্য হল সুখে-দুঃখে স্বামীর পাশে থাকা। তোমার এমন বিপদের দিনে আমি তোমার পাশে থাকব না, তা হয় না। তুমি আমাকে সঙ্গে নাও।

বিক্রম আর কি করেন, অনুরাধাকে সঙ্গে নিলেন।

অরণ্যের যে জায়গায় জল-ফল-মূল পর্যাপ্ত পরিমাণে ছিল, বিক্রম সেখানে একটি পর্ণকুটির তৈরী করে অনুরাধাকে নিয়ে বাস করতে লাগলেন।

অনুরাধা স্বামীর সেবা যত্নে কোন ত্রুটি রাখলেন না। খুব ভোরে উঠে ঘরের সব কাজ সেরে, স্বামীর মুখ-হাত ধুইয়ে দিয়ে, তাঁকে খাইয়ে নিজে একটা কলসী ও ঝুড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়তেন জল ও ফল-মূল সংগ্রহ করে আনার জন্য। এগুলি যোগাড় করা হয়ে গেলে বাড়ি এসে আবার বিক্রমের পরিচর্যা করতেন। তাঁর সতর্ক সেবাযত্নে বিক্রমের শারীরিক কষ্ট অনেকটা কমল।

একদিন নিকটবর্তী গাছগুলোতে ফল না থাকায় অনুরাধাকে ফল পাড়তে যেতে হল অনেক দূরে। খানিকটা যাবার পরেই ওঁর নজরে পড়ল একটা ঝরণা। স্ফটিকের মত পরিষ্কার জল, যেন কলকল করে হাসতে হাসতে এগিয়ে চলেছে অজানা পথে।

সেই স্বচ্ছ জলরাশির অশান্ত নাচ দেখে অনুরাধা নিজেকে আর

সামলে রাখতে পারলেন না ছোট মেয়ের মত তখুনি নেমে পড়লেন ঝরণার জলে। স্নান করলেন।

স্নান সারতেই অবাক কাণ্ড। অনুরাধার শরীর থেকে এক অদ্ভুত সোনালী আভা ঠিকরে বেরুতে লাগল। রূপসী অনুরাধা আরও সুন্দরী হয়ে উঠলেন।

নিজের শরীরের এই পরিবর্তন অবশ্য অনুরাধার নজরে পড়ল না। তিনি স্নান সেরে প্রতিদিনের মত সেদিনও ঝরণার জলে কলসী ডুবিয়ে এক কলসী জল নিয়ে ফল সংগ্রহের জন্য এগিয়ে চললেন।

ঠিক সেই সময় ঐ বনপথ দিয়ে যাচ্ছিল এক ব্যাধ।

নির্জন এই অরণ্যের মধ্যে রূপসী অনুরাধাকে দেখে ব্যাধ একটু অবাকই হয়েছিল। তার চেয়েও আশ্চর্য হল অনুরাধার গা থেকে অমন সোনালী আভা বেরোতে দেখে। অনুরাধার শান্ত চোখমুখ, ধীর নম্র পদক্ষেপ দেখে ব্যাধের আরও ভালো লাগলো। সে ওঁকে বিয়ে করতে চাইল।

ব্যাধের কথা যেন শুনতে পান নি, এমন ভাব করে অনুরাধা ব্যাধের পাশ কাটিয়ে নিজের কুটিরের দিকে এগোতে চাইলেন।

ব্যাধ ছাড়বে কেন? অনুরাধাকে তার ভালো লেগেছে। সে ওঁর পথ আটকে দাঁড়াল। বলল—তুমি আমার কথার জবাব দিলে না যে?

অনুরাধার রাগ হয়েছিল ভীষণ। একেই তিনি বেশ খানিকটা দূরে চলে এসেছেন, ঘরে অসুস্থ স্বামী অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছেন, তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে যাওয়া দরকার—ঠিক সেই সময়ে লোকটা অহেতুক বিরক্ত করছে। বেশ রাগতভাবেই অনুরাধা বললেন—আমায় ছেড়ে দিন।

ব্যাধ বলল—আমার কথার জবাব না দিয়ে তুমি এখান থেকে যেতে পারবে না।

অনুরাধা ব্যাধের আচরণ দেখে ক্রমেই ক্রুদ্ধ হয়ে উঠছিলেন।

বললেন—আমার স্বামী আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। আমাকে যদি আপনি পথ ছেড়ে না দেন তাহলে আপনি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবেন।

ব্যাধ অনুরাধার কথায় হো হো করে হেসে উঠল। সে হাত বাড়িয়ে অনুরাধাকে ধরতে গেল। বলল—দেখি, তোমার ক্ষমতা কেমন। আমাকে নিশ্চিহ্ন কর তো দেখি।

এত স্পর্ধা অনুরাধার সহ্য হল না। তিনি নিজের কলসীর জল হাতে নিয়ে ব্যাধের দিকে ছুঁড়ে মারলেন।

ঐ জল গায়ে লাগার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাধের মনে হল যেন তার উপর ঝড় বইছে। সে তখুনি মাটিতে পড়ে গেল। এই ফাঁকে অনুরাধা ব্যাধের হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে কুটিরের দিকে রওনা হলেন।

কিন্তু ফিরতে অনেকটা দেরি হয়ে গিয়েছিল।

বিক্রম অবাক চোখে বললেন—কি ব্যাপার অনুরাধা? আজ তোমার ফিরতে এত দেরি হল কেন?

অনুরাধা তখন পথে যা যা ঘটেছিল, তা বললেন স্বামীকে।

কিন্তু বিক্রম স্ত্রীর কথা বিশ্বাস করলেন না। ব্যঙ্গের সুরে বললেন—মেয়েরা বানিয়ে বানিয়ে খুব ভালো মিথ্যে কথা বলতে পারে, মিথ্যাকে সত্য বলে চালিয়ে দিতে পারে। তোমার তো খুব সুবিধে, তুমি মেয়েমানুষ, তোমাকে এখানে বলার কেউ নেই, যেখানে খুশি যেতে পার, যার সঙ্গে খুশি ঘুরে বেড়াতে পার।

ব্যাধের কথা বলতে গিয়ে অনুরাধা একটিও মিথ্যে কথা বলেন নি, ঠিক যা যা ঘটেছিল তাই বলেছিলেন। এখন স্বামীকে তাঁর কথায় বিশ্বাস না করতে দেখে, ব্যঙ্গ করতে দেখে, অনুরাধা খুব দুঃখ পেলেন। রাগে, দুঃখে ও অভিমানে পরিপূর্ণ হয়ে গেল তাঁর মন। স্বামীর দিকে তাকিয়ে দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন—আমার সব কথা যদি সত্য হয়, যদি আমি এতটুকু মিথ্যার আশ্রয় না নিয়ে থাকি, তাহলে এই মুহূর্তে যেন তোমার কুষ্ঠ রোগ দূর হয়।

এই বলে কলসীতে তিনি যে ঝরণার জল এনেছিলেন, সেই জল বিক্রমের মাথায় ঢেলে দিলেন।

অনুরাধা ছিলেন সত্যবাদী পতিব্রতা মহিলা, তাঁর কথা মিথ্যা হল না। সত্যিই জল গায়ে লাগার সঙ্গে সঙ্গে বিক্রমের শরীর থেকে কুষ্ঠ রোগ দূর হল। তিনি হয়ে উঠলেন আগেকার মত দিব্যকান্তি এক পুরুষ। গোটা শরীর থেকে বিচিত্র এক আভা ঠিকরে বেরোতে লাগল।

বিক্রম নিজের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, কোথায় কুষ্ঠ রোগ! তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছেন।

সাধারণ কোন মানুষের জীবনে এই ঘটনা ঘটলে সে যা করত, বিক্রমও তাই করলেন। রোগটা যে দূর হল পতিব্রতা স্ত্রী অনুরাধার জন্যই, সে কথা তাঁর আর মনে রইল না। আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠলেন তিনি। স্ত্রীকে ছেড়ে তখুনি রওনা হলেন রাজধানীর দিকে। রাজপ্রাসাদের সম্মুখস্থ উদ্যানে গিয়ে হাজির হয়ে প্রহরীকে বললেন রাজাকে খবর দিতে।

প্রহরী লক্ষ্য করেছিল বিক্রমের দেহে কুষ্ঠরোগের চিহ্নমাত্র নেই। সে তখুনি রাজাকে খবরটা দিল।

রাজা তো আনন্দে ডগমগ হয়ে উঠলেন। পাত্র-মিত্র-অমাত্য নিয়ে তিনি তখুনি হাজির হলেন উদ্যানে। পুত্রকে আলিঙ্গন করে তাঁকে আশীর্বাদ করলেন, তারপর অনুরাধার কথা জিজ্ঞেস করলেন।

এতক্ষণে বিক্রমের খেয়াল হল, আনন্দের আতিশয্যে তিনি স্ত্রীকে সঙ্গে আনেন নি। একটু লজ্জিত হয়ে তখুনি লোক পাঠিয়ে স্ত্রীকে বন থেকে নিয়ে এলেন রাজপ্রাসাদে।

অনুরাধা এলে রাজা তাঁকে যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে বরণ করে নিয়ে এলেন রাজপ্রাসাদে। বিক্রমের কাছ থেকে ইতিমধ্যেই তিনি তাঁর রোগমুক্তিতে অনুরাধার ভূমিকার কথা শুনেছিলেন। তাই পুত্রবধূর প্রতি তাঁর স্নেহ আরও বাড়ল। বিক্রমকে সিংহাসনে বসিয়ে

এবং অনুরাধাকে দেশের রাণীর মর্যাদা দিয়ে তিনি বাণপ্রস্থে চলে গেলেন।

সিংহাসনে বসার পর বিক্রম আরও কয়েকজনকে বিয়ে করলেন।

অনুরাধা রাণীর মর্যাদা পেয়েছিলেন বটে, কিন্তু বিক্রম রীতিমত বিলাসী হয়ে উঠে তাঁর খোঁজখবর বিশেষ একটা রাখতেন না।

স্বামীর অবহেলায় অনুরাধা মনে খুবই ব্যথা পেলেন, কিন্তু মুখে কিছুই বলতেন না। মনের দুঃখে দিনকে দিন তাঁর শরীর ভেঙ্গে পড়তে লাগল।

অনেকগুলো বছর এভাবে কেটে গেল।

ইতিমধ্যে একদিন বন থেকে ফিরে এলেন বিক্রমের পিতা। বিক্রমের মত অনুরাধার সঙ্গেও তার দেখা হল। তাঁর শরীরের অবস্থা দেখে তিনি অবাক হয়ে গেলেন। জিজ্ঞেস করলেন—মা, তুমি এত রোগা হয়ে যাচ্ছ কেন?

অনুরাধা কাঁদতে কাঁদতে শ্বশুরকে সব কথা বললেন। জানালেন, স্বামী কিভাবে তাঁর প্রতি অবহেলা ও অনাদর দেখাচ্ছেন, ফলে কিভাবে মনের দিক থেকে তিনি নিঃস্ব হয়ে পড়ছেন।

সব শুনে বিক্রমের বৃদ্ধ পিতা খুবই মর্মাহত হলেন।

তিনি তখুনি দেখা করলেন বিক্রমের সঙ্গে। তাঁকে বললেন—ন্যায় পথে চলাই দেশের রাজার একমাত্র কর্তব্য। শুধু প্রজাদের প্রতি কর্তব্য পালন করলেই হয় না, নিজের ঘর-সংসারের প্রতিও যে তোমার একটা কর্তব্য আছে, এ কথা তুমি ভুলে গেলে কি করে?

বিক্রম এতক্ষণে বুঝতে পেরেছেন, রাজা কি কারণে তাঁর কাছে এসেছেন। অনুরাধার প্রতি তিনি যে সঠিক আচরণ করেন নি, এ কথা তিনি নিজেই বুঝতে পেরছিলেন। তাই পিতার কথার কোন উত্তর না দিয়ে তিনি মাথা নিচু করে রইলেন।

বিক্রমের পিতা বললেন—অনুরাধার মুখ থেকে সব কথা শুনে বনে গিয়েছিলে, তখন একমাত্র অনুরাধাই তোমার সঙ্গে ছিল। দিনরাত

সে তোমার পরিচর্যা ও সেবাযত্ন করেছে, নিজের দিকে একবারও তাকায় নি, তাই তোমার রোগমুক্তি ঘটেছে। দেখ বাবা, যে কেউ একটা দেশের রাজা হতে পারে, কিন্তু পতিব্রতা স্ত্রী সকলের ভাগ্যে জোটে না। তুমি যদি অনুরাধাকে উপেক্ষা কর, তাঁর প্রতি অবহেলা দেখাও, তাহলে তার পরিণামে তোমাকে অনেক কষ্ট সহ্য করতে হবে।

পিতার কথা শুনে বিক্রমের চৈতন্যোদয় হল। তিনি পিতার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করে এলেন অনুরাধার কাছে। তাঁর কাছেও ক্ষমা চাইলেন।

স্বামীর এই আচরণের জন্য ঠিক প্রস্তুত ছিলেন না অনুরাধা। স্বামীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে তিনি শুধু বললেন—তোমাকে ক্ষমা করার স্পর্ধা আমার নেই, তুমি শুধু তোমার চরণে আমাকে স্থান দাও।

দুজনের কেউই চোখের জল চেপে রাখতে পারলেন না। চোখের জলের মধ্য দিয়েই আবার বিক্রম ও অনুরাধার মিলন ঘটল।

যোগশক্তির মহিমা

[যোগসাধনা করলে কি হয় ? অনুগামীদের অনেকেই বিবেকানন্দের কাছে জানতে চাইলেন প্রশ্নের উত্তর। বিবেকানন্দ তার উত্তরে অনুগামীদের শোনালেন মহাসাধক ত্রৈলঙ্গ স্বামীর জীবনের কয়েকটি ঘটনা।]

ভারতের মাটিতে যে কজন মহাশক্তিধর সাধক জন্ম ভারতভূমির মুখ উজ্জ্বল করেছেন, ত্রৈলঙ্গস্বামী তাঁদের অন্যতম। শুধু সাধক বললে তাঁকে ছোট করা হবে—তিনি ছিলেন মহাসাধক, মহাযোগী। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের বহু মানুষ দীর্ঘদিন তাঁর আশ্চর্য ক্ষমতার পরিচয় পেয়েছেন, অসীম শ্রদ্ধায় তার কাছে নত করেছেন মাথা।

ত্রৈলঙ্গস্বামী বেশির ভাগ সময়েই একেবারে উলঙ্গ হয়ে ঘুরে বেড়াতেন। সাধক মানুষ, কখন কি মর্জি হয় বলা মুসকিল—তাই কেউ তাকে কিছু বলতেন না, বরং সকলেই তাকে সমীহ করতেন।

কিন্তু প্রকাশ্যে উলঙ্গ হয়ে থাকাটা ভদ্রতা নয়।

বারাণসীর শাসক তখন এক ইংরেজ। একদিন পথ দিয়ে চলেছিলেন তিনি। এমন সময় দেখলেন, ত্রৈলঙ্গস্বামী রাস্তা দিয়ে চলেছেন উলঙ্গ হয়ে। মাথায় জটজুট, বলিষ্ঠ, নজরে পড়ার মত চেহারা।

সাহেবের সঙ্গে ছিল বেশ কয়েকজন সঙ্গী। একজন মানুষকে প্রকাশ্যে এভাবে উলঙ্গ হয়ে পথ চলতে দেখে সাহেব কিছুটা অবাক হয়েই সঙ্গীদের জিজ্ঞেস করলেন—ইনি কে ?

সঙ্গীরা সম্ভ্রমের সঙ্গে বললেন—ইনি ত্রৈলঙ্গস্বামী। মস্তবড় সাধক।

সাহেব বললেন—তা হতে পারেন, কিন্তু রাস্তা দিয়ে উলঙ্গ হয়ে চলছেন কেন ?

সঙ্গীরা জানালেন, উনি যোগী পুরুষ, আত্মপর ভেদাভেদ নেই, তথাকথিত ভদ্রতা-অভদ্রতা মানেন না।

সাহেব কিন্তু ওসব কথা শুনতেই চাইলেন না। বললেন—আমি এই সাধুকে শিক্ষা দেব। যাতে উনি লোকালয়ে উলঙ্গ হয়ে চলার স্পর্ধা না পায়।

সঙ্গীরা সাহেবকে নিষেধ করলেন। বললেন—সাহেব, ভুলেও অমন কাজ করতে যাবেন না। উনি যোগী মানুষ, যোগীকে কেউ কোন বাঁধনে বাধতে পারেন না, ওঁকে তো ধরাই মুসকিল।

সাহেবের ধারণা হল, তার সঙ্গীরা সাধুটির সম্বন্ধে অনেক কিছু বাড়িয়ে বলছেন। ধরা মুসকিল মানে? এত বড় পুলিশবাহিনী রয়েছে—একটা লোককে তারা ধরতে পারবে না?

সাহেব নিজের অফিসে ফিরে এসে এক পুলিশবাহিনী পাঠালেন ত্রৈলঙ্গস্বামীকে ধরবার জন্য।

পুলিশ ত্রৈলঙ্গস্বামীর ডেরায় এল। বলল—সাহেব আপনাকে ডেকেছেন, আপনি চলুন।

ত্রৈলঙ্গস্বামী হো হো করে হেসে উঠলেন—কে তোমাদের সাহেব? আমি কারুর হুকুম মানি না, তোমাদের সাহেবকে গিয়ে বল সে কথা।

পুলিশরা এসে যখন সে কথা জানাল, সাহেব তখন তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন। একটা সাধুর এত বড় স্পর্ধা যে তার আদেশ অমান্য করেন?

সাহেব এবার আরও বড় এক পুলিশবাহিনীকে পাঠালেন। বললেন—প্রয়োজনে বেঁধে আনবে ঐ জংলী সাধুকে।

আবার পুলিশ এল, তারা এসে আবার সাহেবের হুকুমের কথা বলল। বলল, না গেলে তারা তাকে বেঁধে নিয়ে যাবে।

ওদের কথা শুনে ত্রৈলঙ্গস্বামী মৃদু হাসলেন। বললেন—বেশ, চল তাহলে।

পুলিশ বাহিনী খুশি। কিছু আর করতে হবে না, সাধুজী নিজেই যাবেন।

সত্যিই ত্রৈলঙ্গস্বামী সুবোধ বালকের মত উলঙ্গ অবস্থাতেই ঐ পুলিশবাহিনীর পিছু পিছু চললেন।

পুলিশ তাকে নিয়ে এল আদালতে। প্রকাশ্যে অশালীন আচরণের অভিযোগে তার নামে মামলা দায়ের করল।

বিচারক সব শুনলেন। প্রমাণের প্রয়োজন ছিল না, কারণ সাধুজী আদালতেও হাজির হয়েছেন উলঙ্গ অবস্থায়। বিচারক হুকুম দিলেন—সাধুজীকে হাতকড়া দিয়ে বাঁধো।

এক পুলিশ হাতকড়া নিয়ে তাকে বাঁধতে গেল।

কিন্তু, কোথায় সাধু? সকলের চোখের সামনেই তিনি উধাও!

বিচারক এবং আদালতে উপস্থিত সকলে তো অবাক। ভেলকি-বাজির কথা এতকাল শুনেই এসেছেন, কিন্তু দেখেন নি—এই প্রথম দেখলেন।

বিচারক অবাক হয়ে বললেন—আশ্চর্য! লোকটা কি হাওয়ায় মিলিয়ে গেল নাকি?

সেই মুহূর্তে আদালতকক্ষে আবার দেখা গেল ত্রৈলঙ্গস্বামীকে। সকলের দিকে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসছেন।

বিচারকের ততক্ষণে জ্ঞানচক্ষু ফুটেছে। তিনি বুঝেছিলেন, এই সাধু বড় সামান্য পুরুষ নন, একে না ঘাঁটানোই ভাল।

তিনি হুকুম দিলেন—একে ছেড়ে দাও।

ত্রৈলঙ্গস্বামী হাসতে হাসতে চলে গেলেন।

আর একবার।

সেবার এক কড়া মেজাজের ইংরেজ বারাণসীর শাসক হয়ে এলেন। তিনিই একদিন পথে দেখলেন ত্রৈলঙ্গস্বামীকে উলঙ্গ হয়ে চলতে।

ক্রুদ্ধ হলেন ইংরেজ শাসক। বললেন—এ কি অসভ্যতা? ঐ সাধুকে ধরে এনে হাজতে বন্দী করে রাখ।

এক বিরাট পুলিশবাহিনী তখুনি এগিয়ে গিয়ে ত্রৈলঙ্গস্বামীকে পাকড়াও করল। হাতকড়া পরিয়ে দিল তার হাতে। দড়ি দিয়ে

কোমর বাঁধল। তারপর টানতে টানতে নিয়ে এল থানায়। ঢুকিয়ে দিল হাজতে।

পরদিন সকালে সকলের চক্ষু স্থির।

জেল হাজতে হাত-পা বাঁধা ত্রৈলঙ্গস্বামীর চিহ্নমাত্র নেই কোথাও। হাজতের তালা-চাবি সব ঠিক আছে, শুধু তিনি ভেতরে নেই!

কিন্তু তাকে তো বেঁধে রাখা হয়েছিল। হাতে ছিল হাতকড়া, কোমরে দড়ি। সেই অবস্থায় বাইরে বেরোনোও তো কারুর পক্ষে সম্ভব নয়।

তাহলে কোথায় গেলেন তিনি?

খোঁজ, খোঁজ। বিরাট পুলিশবাহিনী বেরিয়ে পড়ল তাকে খুঁজে বের করতে।

এক সময় পাওয়া গেল ত্রৈলঙ্গস্বামীকে। ঠিক যেখান থেকে পুলিশ-বাহিনী ধরেছিল ওঁকে, ঠিক সেখানেই বসে আছেন তিনি! কোথায় হাতকড়া আর কোমরের দড়ি—কিছুই নেই। নিশ্চিন্ত মনে চোখ বুজে জপ করছেন।

বিরাট পুলিশবাহিনী দাঁড়িয়ে রইল ত্রৈলঙ্গস্বামীকে ঘিরে।

এক সময় চোখ খুললেন সাধু।

পুলিশবাহিনীর নেতা হাত জোড় করে বলল—আপনাকে একবার যেতে হয় সাধুজী আমাদের সাহেবের কাছে, নইলে আমাদের চাকরি থাকবে না।

ত্রৈলঙ্গস্বামী বললেন—বেশ, চল তাহলে।

পুলিশবাহিনীর সঙ্গে ত্রৈলঙ্গস্বামী এলেন ঐ ইংরেজ শাসকের কাছে। সাধুজীকে দেখে তার তো চক্ষু স্থির। আগের সেই তাচ্ছিল্য ভাব আর রইল না। হাজত থেকে চলে যাবার ঘটনা শুনেই তিনি বুঝেছিলেন, ত্রৈলঙ্গস্বামী বড় সাধারণ মানুষ নন।

পরম সমাদরে সাধুজীকে নিজের ঘরে বসালেন সাহেব। বললেন—কি করে এমন ব্যাপার সম্ভব হল সাধুজী?

—কোন্ ব্যাপার? সব বুঝে না বোঝার ভাণ করলেন ত্রৈলঙ্গস্বামী।

—ঐ যে হাতকড়া লাগানো, কোমরে দড়ি বাঁধা অবস্থাতেই জেল হাজত থেকে অন্তর্ধান হওয়ার ঘটনা। সাহেব তেমনি অবাক চোখেই বললেন।

ত্রৈলঙ্গস্বামী মৃদু হেসে বললেন—সাহেব, তুমি দেশের শাসক হয়েছো, কিন্তু আসল কথাটাই জানো না। মানুষের দেহে আছে শুদ্ধ ও নির্মল আত্মা। সেই আত্মাকে যিনি জানতে পারেন, তাঁর আত্মজ্ঞান হয়, আর আত্মজ্ঞান হলে সব ভেদ দূর হয়ে যায়, দেহের বাঁধনে তিনি বাঁধা পড়েন না। হাতকড়া আর দড়ি তাই আমাকে বেঁধে রাখতে পারে নি, আমি বেরিয়ে এসেছি।

সাহেব আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলেন—কিন্তু আত্মজ্ঞান লাভের সূত্র কি?

ত্রৈলঙ্গস্বামী তেমনি হেসে বললেন—যোগ সাধনা। যোগ আশ্চর্য কাণ্ড ঘটাতে পারে। যোগী পুরুষের কাছে সব বন্ধ দরজা খুলে যায়।

ইংরেজ শাসক অবাক হয়ে শুনছিলেন ভারতীয় সাধুর কথা। যোগসাধনার যে এমন আশ্চর্য মহিমা, তা জানতেন না তিনি। এবার যোগীদের সম্বন্ধে তিনি শ্রদ্ধাশীল হলেন। ত্রৈলঙ্গস্বামীকে বললেন, তিনি তার ইচ্ছেমত যেখানে যেমনভাবে খুশি ঘুরে বেড়াতে পারেন। কেউ তাকে বাধা দেবে না বা বিরক্ত করবে না।

বুদ্ধির জয়

[বুদ্ধি যার, বল তার—প্রবাদেই বলা হয়েছে সে কথা। সত্যিই উপস্থিত

বুদ্ধির জোর অনেক। মানুষ তার প্রভাবে অসাধ্য সাধন করতে পারে, বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে পারে। বুদ্ধিপ্রয়োগে বিপদ থেকে এক ব্রাহ্মণের উদ্ধার পাওয়ার একটি চমৎকার গল্প বলে বিবেকানন্দ তাঁর অনুগামীদের বুঝিয়ে দিলেন, বুদ্ধির জয় সর্বত্র।]

এক ব্রাহ্মণ শহরে গিয়েছিলেন পুজো করতে।

বড়লোকের বাড়ির পুজো, দেওয়া-থোওয়ার ব্যাপার ছিল বেশ। যজমান ব্রাহ্মণের পুঁটলিতে শুধু চাল-কলা-ফলই বেঁধে দিল না, বেশ কিছু টাকাপয়সা এবং ধনরত্নও সাথে দিয়ে দিল। ব্রাহ্মণ খুব খুশি। বাড়ি থেকে এত দূরে শহরে আসাটা সার্থক হয়েছে। সব বেঁধে-ছেদে তিনি রওনা হলেন বাড়ির পানে।

ব্রাহ্মণ থাকতেন গ্রামে। শহর থেকে সেখানে যেতে হলে একটা নির্জন বনপথ অতিক্রম করতে হয়। সেখানে শুধু হিংস্র জীবজন্তুরাই থাকে না, বনের গভীরে এক নামকরা ডাকাতেরও আস্তানা আছে। সে একটি পথিককেও ছেড়ে দেয় না। যার কাছে যা থাকে সব কেড়েকুড়ে নেয়।

ব্রাহ্মণ জানতেন সে কথা। তাই শহর থেকে রওনা হয়েছিলেন খুব সকালেই। ভেবেছিলেন সন্ধ্যের আগেই বনটা পেরিয়ে যেতে পারবেন। কিন্তু ব্রাহ্মণের হিসেবে ভুল হয়ে গিয়েছিল। বয়েস হয়েছে। যতটা দ্রুত পথ চলবেন ভেবেছিলেন, তার চেয়ে অনেক বেশি সময় লাগল। তাই বনের মাঝামাঝি জায়গায় যখন তিনি, তখন সন্ধ্যা নেমে এল।

ব্রাহ্মণ পড়লেন মহা বিপদে।

বনের মাঝামাঝি জায়গায় তখন তিনি, চট করে যে পথটা

বিবেকানন্দ কথামৃত/৬৫

পেরিয়ে যাবেন তার উপায় নেই। আবার, থেমে যাবারও উপায় নেই—সারা রাত এই বনের মধ্যে একা থাকবেন কি করে? এমনিতেই চারদিক নিঝুম, গা ছম্ ছম্ করছে। শুকনো একটা গাছের পাতা পড়লেও তার আওয়াজ শোনা যায়, এমন নিস্তব্ধ চারদিক।

অগত্যা ব্রাহ্মণ না থেমে এগিয়ে যাওয়াই স্থির করলেন। আর খানিকটা এগিয়ে গেলেই বনের পথ শেষ হবে। একটা গ্রাম পাওয়া যাবে। একটু জোরেই পা চালালেন ব্রাহ্মণ।

হঠাৎ একটা আওয়াজ কানে এল খস্ খস্! যেন কার পায়ের শব্দ। চমকে উঠলেন ব্রাহ্মণ। দুর্গা নাম জপ করে একবার পিছন ফিরে তাকালেন। যা দেখলেন তাতে তাঁর চক্ষু স্থির।

দৈত্যের মত চেহারার একটা লোক। কালো কুচকুচে গায়ের রং। লম্বা চওড়া বিরাট চেহারা। মাথায় একটা পাগড়ি বাঁধা। হাতে ইয়া মোটা একটা বাঁশের লাঠি।

এক দৌড়ে লোকটা ছুটে এল ব্রাহ্মণের দিকে।

এক লহমায় ব্রাহ্মণ ভালো করে একবার দেখে নিলেন লোকটাকে। চেহারাটা বিরাট হলে কি হয়, বোকা বোকা একটা ভাব তাতে স্পষ্ট।

ব্রাহ্মণ ছিলেন খুব চালাক মানুষ। তাঁর বুঝতে দেরি হল না, লোকটা নিশ্চিত একটা ডাকাত। এখুনি কেড়ে-কুড়ে নেবে সব। কি করা যায় এখন? গায়ের জোরে তো পারা যাবে না, অতএব প্রয়োগ করতে হবে বুদ্ধি। বাঁচতে হবে তো!

হঠাৎ ব্রাহ্মণের মাথায় একটা বুদ্ধি এসে গেল। ডাকাতটা কিছু বলার আগেই তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন—গেল, গেল, আমার সব গেল!

ডাকাতটা ছুটে আসছিল ব্রাহ্মণের দিকে। হঠাৎ ওঁর চেঁচানি শুনে একটু থমকে দাঁড়াল। ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞেস করল—ব্যাপার কি গো বামুন ঠাকুর? এত চেঁচাচ্ছ কেন?

ব্রাহ্মণ কাঁদ কাঁদ স্বরে বললেন—দেখ না ভাই, কি সাংঘাতিক

কাণ্ড। এ বনে তুমি থাকতে এক রোগা টাপটকা লোক এসে আমার সব কেড়ে নিয়ে গেল! আমি একেবারে ফকির হয়ে গেলাম।

ডাকাতটা এসেছিল ব্রাহ্মণের সব কিছু কেড়ে নিতে। কিন্তু তাঁর মুখে আর একটা রোগা লোকের কথা শুনে ডাকাত আর মেজাজ ঠিক রাখতে পারল না। এতদিন তার ধারণা ছিল, এ বনে সে একাই ডাকাতি করে বেড়ায়, তার চেয়ে ক্ষমতাবান এ তল্লাটে কেউ নেই। কিন্তু এখন তো দেখা যাচ্ছে, তার ধারণা ঠিক নয়, এই বনে তার প্রতিদ্বন্দ্বী আছে। প্রতিদ্বন্দ্বীকে মেনে নেওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই সে চিৎকার করে বলল—বটে, এত বড় স্পর্ধা, এ বনে আমার ওপরে যায়? লোকটা কোন্ দিকে পালাল বলতে পার ঠাকুর?

ব্রাহ্মণ বুঝল, তার ওষুধে ফল হয়েছে। মূর্খ ডাকাত তার চালাকি ধরতে পারে নি। চতুর ব্রাহ্মণ মুখে এতটুকু খুশির ছোঁয়া না এনে তেমনি কাঁদ কাঁদ ভাবে বলল—পারি। আমার সামনে দিয়ে লোকটা পালাল, কোন্ দিকে গেল তা বলতে পারব না।

ডাকাতের আর তর সইছিল না। বলল—তাহলে শিগ্‌গির বল, কোন দিকে গেছে লোকটা।

ব্রাহ্মণ ওকে উলটো দিকের পথ দেখিয়ে দিলেন। ডাকাত তখুনি সেই দিকে ছুট লাগাল। যাবার সময় বলে গেল—তুমি এখানে একটু দাঁড়াও বামুন ঠাকুর, আমি লোকটাকে এখুনি ধরে আনছি। আমার ওপর টেক্কা দিয়ে ডাকাতি করতে চায়, এত বড় স্পর্ধা!

এই বলে ডাকাত ছুটল উল্টো দিকে।

ব্রাহ্মণ আর সেখানে। অনেক বুদ্ধি করে এর হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার একটা উপায় বের করেছেন। তিনিও সামনের দিক দিয়ে দ্রুতগতিতে পা চালালেন।

শুধু উপস্থিত বুদ্ধি সে যাত্রায় বাঁচিয়ে দিল ব্রাহ্মণকে।

অর্থই অনর্থ

[আমরা প্রায়ই ভাবি, আমাদের যদি অনেক টাকা থাকত, তাহলে আমাদের দুঃখ-কষ্ট অনেক কমত। কিন্তু বাস্তবে যে অর্থই যাবতীয় বিপদ ও দুঃখের মূল, একটা গল্পের মধ্য দিয়ে বিবেকানন্দ তাঁর অনুগামীদের বুঝিয়ে দিলেন।]

বিরাট এক বাড়ির নিচে বসে কাজ করে এক মুচি রাস্তার ওপার কোন রকমে একটা চাটাই পেতে বসে, রোদ-ঝড়-জল গায়ের ওপর দিয়ে যায়, কিন্তু মুচির সে সবে ভ্রূক্ষেপ নেই। সব সময়েই তার মেজাজ খুশিতে ভরপুর। জুতো সারাতে সারাতে আনন্দে গান গায়।

কি এমন খায়, কি এমন শরীরের যত্ন নেয়, অথচ কোন অসুখ-বিসুখ নেই, স্বাস্থ্যও কি চমৎকার!

সেই বিরাট বাড়ির ধনী মালিক প্রতিদিন মুচির দিকে দেখে আর দুঃখ পায়। বিস্তর টাকা তার, মস্ত বড় বাড়ি, অনেক দাসদাসী, কিন্তু কি আশ্চর্য, এতটুকু আনন্দ নেই তার মনে, প্রায়ই শরীর খারাপ হয়, স্বাস্থ্যও ভালো নয়। বাড়িতে ঢোকার সময় রোজ সে মুচির দিকে তাকিয়ে দেখে আর ভাবে, এ লোকটা গরীব হয়েও রাতদিন কি আনন্দেই না আছে, কত ফুর্তিতে গান গাইছে, অথচ এত টাকা থাকা সত্ত্বেও আমার মনে আনন্দ নেই। অথচ মুচি লোকটা রোজ মনের আনন্দে থাকে তাই না ঐভাবে গান গাইতে পারে। আর গান গাইবার কথা সে চিন্তাই করতে পারে না। কেন আমার এমন হয়?

ধনী অনেক ভেবেও এর কুলকিনারা না পেয়ে শেষটায় ঠিক করল, একদিন মুচির সঙ্গে সে আলাপ করবে; তাকে জিজ্ঞেস করবে কেন তার মনে এত ফুর্তি।

পরদিন সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়ে সে মুচির সামনে গিয়ে বসে পড়ল। হাসিমুখে বলল—কি গো মুচি ভায়া, কেমন আছ?

অমন ধনী মানুষটিকে নিজের পাশে রাস্তায় বসে পড়তে দেখে মুচি প্রথমটায় একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছিল। কোথায় বসতে দেবে, কি করবে, ভেবে পাচ্ছিল না। তাড়াতাড়ি নিজের নোংরা চাটাইটা বের করে ধনীর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল—ছি ছি, কি যে করেন বাবু, ওভাবে বসলেন কেন? নিন, এটার উপরে বসুন।

ধনী কিন্তু চাটাইয়ে না বসে নিজের আসার কারণটা বলল। বলল—থাক থাক, এই তো বসেছি আমি। রোজ বাড়ি থেকে বেরোবার সময় তোমাকে দেখি মনের আনন্দে গান গাও, রোজই ভাবি তোমার সঙ্গে আলাপ করব, কিন্তু সময় হয় না। আজ চলে এলুম।

মুচি তো কথা শুনে কৃতার্থ হওয়ার হাসি হাসল।

ধনী বলল—আচ্ছা, এত গান তোমার আসে কি করে? মাসে কত টাকা রোজগার কর?

মুচি প্রশ্নটা শুনে খুব লজ্জা পেল। তার আয় সামান্য, অমন ধনী মানুষকে নিজের আয়ের কি হিসেব দেবে? লাজুক ভাবে বলল—সত্যি বলতে কি, অমন হিসেব আমি কোনদিন করিনি। আমার কাজের কোনদিন অভাব হয় নি, খাওয়াপরাও মোটামুটি চলে যায়। তাই মাসিক রোজগারের হিসেব করার কোন দরকারই হয় নি।

মুচির এই সহজ কথা শুনে ধনী একটু অবাক হল। তার প্রতিদিনের আয়-ব্যয়ের হিসেব বিরাট বিরাট খাতায় লিখে রাখা হয়, সেসব হিসেব রাখার জন্য এবং পরীক্ষা করার জন্য বেশ কয়েকজনকে সে মাইনে দিয়ে রেখেছে—আর এই লোকটার এ সবের কোন বালাই নেই। একটু খুশি হয়েই সে মুচিকে পরের প্রশ্ন করল—রোজ কতটা কাজ কর তুমি?

মুচি আবার প্রশ্ন শুনে বোকার মত হাসল। বলল—তারও কোন

ঠিক নেই বাবু। কখনও বেশি কাজ করি, কখনও কম। পেট চালানোর জন্য যতটুকু কাজ করা দরকার, ততটুকুই করি।

ধনী খুব খুশি হল মুচির সাদামাটা কথা শুনে। লোকটা সত্যিই খুব সরল, মনে এতটুকু মারপ্যাঁচ নেই, যা মনে আসছে দিব্যি তাই বলে যাচ্ছে। এতটুকু ইতস্তত ভাব নেই কথায়। হঠাৎ ধনীর মনে হল, লোকটার এই সরলতার জন্য তাকে পুরস্কৃত করা উচিত।

ভাবা মাত্র ধনী তার পকেট থেকে তিনশো টাকা বের করে মুচির হাতে দিয়ে বলল—তোমার কথাবার্তা আমার খুব ভালো লেগেছে, তাই এই টাকাটা তোমায় দিলাম।

মুচি টাকাটা নিতে চাইছিল না।

কিন্তু ধনী ছাড়ল না। বলল—উঁহুঁ, ভালোবেসে দিলাম, টাকাটা রেখে দাও। বিপদ-আপদ বা অসুখ-বিসুখের সময় কাজে লাগবে।

মুচি শেষ পর্যন্ত টাকাটা নিল।

ধনী চলে যাবার পর টাকাটা নিয়ে খুব ভালো করে নেড়েচেড়ে দেখল। একসঙ্গে এত টাকা এর আগে জীবনে কখনও দেখে নি সে। মনে তাই খুব আনন্দ হল। মনে মনে ধনীকে খুব প্রশংসা করল। লোকটা তার অভাব বুঝে তাকে সাহায্য করেছে।

কিন্তু পরমুহূর্তেই শুরু হল তার চিন্তা। টাকাটা রাখবে কোথায়। রাস্তায় থাকে সে, রাস্তাতেই ঘুমোয়। এত টাকা তো যেখানে সেখানে রাখা যায় না, চুরি হয়ে যাবে।

অনেক ভেবে মুচি ওর বসার জায়গার পাশেই একটা গাছের নিচে টাকাটা পুঁতে রাখল।

ভেবেছিল, টাকাটা ভালো জায়গাতেই রেখেছে, কিন্তু সন্ধ্যে হতেই সব চিন্তায় গোল বেঁধে গেল। একবার মনে হল, পুঁতে রাখার সময় কেউ যদি দেখে থাকে, তাহলে তো সর্বনাশ—নির্ঘাৎ সে রাতে টাকাটা চুরি করবে। এই ভেবে একেবারে গাছের নিচেই শুয়ে পড়ল সে।

কিন্তু ঘুম আসতে চায় না কিছুতেই। কেবলই চোরের কথা

মনে হয়। অন্যদিন শোয়া মাত্র গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে সে, আজ চোখের পাতাই বুঁজতে চায় না, ঘুম তো দূরের কথা। এরই মধ্যে হঠাৎ গাছ থেকে একটা পাতা পড়ার শব্দ হতেই উঠে বসল। কোথায় চোর? কেউ তো নেই। আবার চোখ বোঁজার চেষ্টা করে মুচি।

একটু পরেই একটা খস্‌খস্ শব্দ। লাফ দিয়ে উঠে বসল মুচি! চোর নয়, একটা বিড়াল। হাঁফ ছেড়ে আবার ঘুমোবার চেষ্টা করে মুচি। ঘুম তো নয়, যেন যুদ্ধ করছে।

ইতিমধ্যে কখন যে রাত কেটে গেল, পূবের আকাশ ফর্সা হয়ে উঠল, পাখিদের মধুর কাকলিতে নিস্তব্ধ সকাল আমোদিত হয়ে উঠল, তা ঠাহর করতে পারল না মুচি। একেবারে ভোরের দিকে একটু তন্দ্রার মত এসেছিল, ভোরের আলো চোখে পড়তেই লাফ দিয়ে উঠে বসল। দু চোখ জ্বালা করছে, সারা রাত একটু ঘুম হয় নি।

অন্যান্য দিনের সঙ্গে মেলাতে গিয়ে মুচি বুঝল, ঐ তিনশো টাকাই হল সব অনর্থের মূল। ঐ টাকার চিন্তাতেই তার মনের আনন্দ গেছে, চিন্তা মনকে আচ্ছন্ন করে ঘুম কেড়ে নিয়েছে। মুচি ভাবল, টাকার জন্য যখন এত ঝামেলা, তখন আর দরকার নেই টাকার। টাকা থাকলেই চিন্তা আর ঝামেলা বাড়ে, না থাকলে কোন ঝামেলা নেই—নিশ্চিন্তে ঘুমোনো যায়, গান করা যায়। আনন্দে থাকা যায়।

গাছের নিচ থেকে টাকাটা বের করে মুচি অপেক্ষা করতে লাগল ধনীর জন্য। সে বেরোতেই তার হাতে টাকাটা দিয়ে বলল—এই নিন বাবু, আপনার টাকা। আপনার এ টাকা আমার আনন্দ কেড়ে নিয়েছে। কাল সারারাত আমি ঘুমাতে পারিনি। গান না গাইলে আমি বাঁচব না বাবু। আপনার টাকা আপনি ফেরত নিয়ে নিন বাবু।

বর চাওয়া

[বর চাওয়া সহজ ব্যাপার নয়, সেটাও বাহাদুরি। অনেক বুদ্ধি আর কৌশল লাগে তাতে। ঈশ্বর অনেক সময় বর চাইতে বলে মানুষের বুদ্ধির পরীক্ষা নেন—একটি প্রচলিত গল্পের উল্লেখ করে বিবেকানন্দ সে কথা বোঝাতে চাইলেন অনুগামীদের।]

এক ছিল অন্ধ।

ভারি দুঃখ তার, কিছুই নেই। টাকাপয়সা নেই, ঘরবাড়ি নেই, ছেলেপুলে নেই, দৃষ্টিশক্তিও নেই যে পৃথিবীর রূপ দেখবে। মনের দুঃখে তাই তার দিন কাটে।

তার দুঃখ দেখে স্বর্গের দেবতারও খুব দুঃখ হল। তিনি ঠিক করলেন, এই অন্ধের কষ্ট দূর করবেন।

স্বর্গ থেকে তাই একদিন তিনি নেমে এলেন নিচে, অন্ধটির কাছে। বললেন—ওরে, তুই আর কাঁদিস নে। আমি দেবতা, তোর কষ্ট দেখে আমার মন টলেছে, তাই তোকে বর দিতে এসেছি। এখন বল, তুই কি বর চাস।

অন্ধ অবাক হয়ে গিয়েছিল দেবতার কথা শুনে। তার দুঃখ দূর করার জন্য দেবতা নিজে এসেছেন, এ তো অভাবনীয় ব্যাপার।

সে দেবতার উদ্দেশ্যে হাত জোড় করে তার স্তুতিগান করল। তারপর বলল—প্রভু, আপনি যদি সত্যিই দয়াপরবশ হয়ে থাকেন, তাহলে বর দিন।

দেবতা বললেন—তোকে বর দেব বলেই এসেছি। তবে, একটা কথা। তুই মাত্র একটা বর পাবি, তাই ভালো করে ভেবেচিন্তে বলিস।

অন্ধ তো কথা শুনে ভেবেই পেল না কি বর চাইবে—প্রথমে ভাবল চোখের দৃষ্টি ফিরে পাবার বর চাইবে আবার ভাবে, শুধু দৃষ্টি দিয়ে কি করবে? হাতে যদি টাকাপয়সা না থাকে, তাহলে তো দৃষ্টিশক্তি অর্থহীন।

তখন অন্ধ ভাবল, সে টাকাপয়সা বা ঘরবাড়ি চাইবে। ভাবতেই মনে হল, ওসব চেয়েই বা তার কি লাভ হবে। তার ছেলেপুলে নেই, ভোগ করার লোক নেই। দুদিন বাদে যখন সে মরে যাবে, তখন তার টাকাপয়সা তো অন্য লোকে নিয়ে যাবে।

আবার ভাবল, তার চেয়ে মনের সুখ চাই। সব কিছু থেকেও যদি মনের সুখ না থাকে, তাহলে তো সবই বৃথা।

এ রকম এক ভাবনা থেকে আর এক ভাবনায় যেতে যেতে অন্ধ কিছুতেই ঠিক করতে পারছিল না, সে কি বর চাইবে।

তার ইতস্তত ভাব দেখে দেবতা বললেন—ঠিক আছে, তুই যদি এখন বলতে না পারিস, তাহলে না হয় কাল বলিস। কাল আমি আবার আসব। এর মধ্যে ভালো করে ভেবে রাখ।

দেবতা চলে গেলেন।

বেচারা অন্ধ পড়ল মহা ফাঁপরে। সারাদিন ধরে ভাবলই, ভাবনার চোটে সারা রাত একটু ঘুম হল না।

ভোরবেলা আবার দেবতা এসে হাজির। বললেন—আমি এসেছি। এখন বল, কি বর চাস।

অন্ধের বুদ্ধি হঠাৎ যেন খুলে গেল। সে হাত জোড় করে বলল—প্রভু, আপনি আমায় এমন বর দিন, আমি যেন চারতলা বাড়িতে সোনার পালঙ্কে বসে দেখতে পারি, আমার নাতি-নাতনীরা আমার সাথে বসে একসাথে সোনার থালায় রাজভোগ খাচ্ছে।

অন্ধের বর চাওয়ার বাহাদুরি দেখে দেবতা হেসে ফেললেন। এমন কায়দায় একটি বর চেয়েছে যে সব কিছুই চাওয়া হয়ে গেছে সোনার পালঙ্ক চেয়েছে—তার মানে ধনী হবে চোখে দেখার কথা

বলেছে—তার মানে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবে, নাতি-নাতিনীর উল্লেখ করেছে—তার মানে ভালো বাড়িও হবে তার! অনেকগুলো কথা, কি সুন্দর করে একটা বাক্যের মধ্যে সব কথাগুলোকে গুছিয়ে বলেছে অন্ধ।

দেবতা তাই হেসে বললেন—তুই বাহাদুর বটে। তোর সব আশাই পূর্ণ হবে।

দেবতার আশির্বাদে সত্যিই অন্ধ সব পেয়েছিল। দৃষ্টিশক্তি, ছেলেপুলে, ঘরবাড়ি, টাকাপয়সা—সব কিছু। এককালের দুঃখী মানুষটা হল পৃথিবীর অন্যতম সুখী মানুষ।

বীরত্বের পুরস্কার

[বীরের একটা বিশেষ গুণ থাকে—তিনি কাপুরুষ নন, কারুর কাছে মাথা নোয়ান না। তাঁর এই মাথা উঁচু করে চলার স্বভাবের জন্য তিনি বহু বিপদে পড়েন, কিন্তু প্রতিবারই ঈশ্বর তাঁর পাশে এসে দাঁড়ান, সব বিপদ অনায়াসেই অতিক্রম করেন তিনি। এই কথা বলতে গিয়ে পাশ্চাত্যের এক বীরের কাহিনী শোনালেন বিবেকানন্দ।]

নাম তাঁর উইলিয়াম টেল। মস্ত বড় তীরন্দাজ। অব্যর্থ লক্ষ্য। যাকে লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়বেন, তাঁর মৃত্যু হবেই।

টেল যেমন সাহসী তেমনি বীর। রীতিমত গুণী মানুষ। সবচেয়ে বড় গুণ, তিনি সাহসী। ভয় কাকে বলে জানেন না। নিজে অন্যায় করেন না, অন্যায় সহ্য করেন না—প্রকাশ্যে অন্যায়ের প্রতিবাদ করেন, নিজের ভালোমন্দের কথা তখন তাঁর মনে থাকে না।

টেল-এর চরিত্রের এই বিশেষ গুণই একবার হয়ে উঠল তাঁর কাল।

রাজা একবার তাঁকে একটি অন্যায় আদেশ করেছিলেন। টেল সঙ্গে সঙ্গে সেই আদেশ পালনে অস্বীকার করলেন। ব্যস্, রাজরোষে পড়তে হল তাঁকে।

বিপদ বুঝে টেল নিজের দশ বছরের একমাত্র ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে দেশ ছেড়ে পালালেন।

কিন্তু রাজাতো এত সহজে ছেড়ে দেবার পাত্র নন। হুকুম দিলেন—যে ভাবে হোক, টেলকে ধরা চাই। সেই সঙ্গে ঘোষণা জীবিত বা মৃত যে কোন অবস্থায় যে টেলকে ধরে আনতে পারবে মোটা পুরস্কার তাকে দেবেন।

প্রহরীরা টেলকে ধরার জন্য হন্যে হয়ে খুঁজতে লাগল।

কিন্তু অত বড় তীরন্দাজকে ধরা কি মুখের কথা? সবাই জানে.

টেল একা লড়তে পারেন অনেক লোকের সঙ্গে। তাই খুব সর্তক না হয়ে তাঁকে ধরার চেষ্টা করলে নিজেদেরই মরতে হবে।

তবু চেষ্টার ত্রুটি রাখল না প্রহরীরা।

এদিকে ছেলেকে নিয়ে টেল ঢুকে পড়েছেন গভীর জঙ্গলে। বনের ফলমূল খেয়ে দিন কাটে। কখনও বা পাখি শিকার করেন। পাখির মাংস আগুনে ঝলসে খান।

প্রহরীরা তন্ন তন্ন করে খুঁজতে খুঁজতে টেলের সেই গোপন আস্তানায় খবর পেয়ে গেল। তারা ঘিরে ফেলল টেল ও তাঁর ছেলেকে।

একা থাকলে টেল-এর ভয় ছিল না। একাই ওদের সঙ্গে লড়তে পারতেন। কিন্তু সঙ্গে যে রয়েছে ছেলে, ওকে নিয়েই তো বেশী ভয়। লড়তে গেলে যদি ওর কিছু হয়।

অনেক ভেবেচিন্তে টেল ঠিক করলেন, তিনি লড়বেন না, রাজার সৈন্যদের কাছে ধরা দেবেন।

প্রহরীদের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে টেল জানালেন—আমি লড়তে চাই না। আত্মসমর্পণ করব।

প্রহরীদের তো প্রথমে বিশ্বাসই হয় নি, টেল-এর মত মানুষ আত্মসমর্পণ করতে পারেন। কিন্তু পুরোপুরি লড়াইয়ের জন্য তৈরী হয়ে সাবধানে এগিয়ে এসে তারা দেখল, তীর-ধনুক পাশে রেখে টেল ধরে আছে ছেলের হাত। লড়াই করার কোন ইচ্ছাই নেই।

প্রহরীরা দুজনকে বেঁধে নিয়ে গেল রাজার কাছে।

এত সহজে টেলকে ধরা যাবে, রাজাও তা বিশ্বাস করতে পারেন নি। অদূরে দাঁড় করানো টেলকে দেখে একবার তাঁর মনে প্রতিহিংসা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। রাজার আদেশ অমান্য করার স্পর্ধা দেখায় লোকটা? এর ফল কি, তা বুঝিয়ে দিতে হবে ওকে।

কিন্তু রাজা তো আর সাধারণ মানুষ নন। সাধারণ মানুষের মত উচ্ছ্বাস, আবেগ বা রাগ প্রকাশ করেন না তিনি। তাঁর হাবভাব দেখে বোঝা যায় না মনে মনে তিনি কি ঠিক করেছেন।

টেলও কিছুই বুঝতে পারছিলেন না। তবে তিনি যে সহজে ছেড়ে দেবেন না, টেল তা অনুমান করতে পারছিলেন।

হঠাৎ হো হো করে হেসে উঠলেন রাজা। বললেন—তাহলে শেষ পর্যন্ত তুমি আমার কাছে এলে ?

শৃঙ্খলিত টেল কোন উত্তর দিলেন না।

রাজা বললেন—এখন তুমি আমার বন্দী। এবার কিন্তু তোমাকে আমার কাছে মাথা নোয়াতে হবে।

এবার আর টেল চুপ থাকলেন না। দৃপ্ত কণ্ঠে বললেন—উইলিয়াম টেল কারুর কাছে মাথা নোয়ায় না। তার অভিধানে ঐ শব্দটা নেই।

রাজা হেসে উঠলেন—বন্দীর মুখে এ কথা মানায় না টেল। আমি তোমায় কি করতে পারি জানো ?

টেলও হাসলেন—জানি। ইচ্ছে করলে এখুনি আমার মাথাকে ধড় থেকে আলাদা করে ফেলতে পারেন।

রাজা কথাটা শুনে আবার আগের মত অট্টহাসি হেসে উঠলেন। বললেন—ছি ছি, তোমার মত এত বড় একজন ধনুর্ধরের মাথা ওভাবে চট করে আলাদা করে দিলে যে খুব অন্যায় কাজ হবে টেল। আমি তোমায় মারব না, শুধু নিজের চোখে দেখতে চাই কত বড় বীর তুমি। বীরত্বের সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে আমি তোমায় সসম্মানে মুক্তি দেব।

টেল বললেন—বলুন, কি পরীক্ষা দিতে হবে আমাকে।

রাজা বললেন—তোমার ছেলের মাথায় আমি একটা আপেল বসিয়ে দেব। একশো হাত দূরে দাঁড়িয়ে একটা তীর দিয়ে ঐ আপেলটাকে বিঁধতে হবে তোমায়।

চমকে উঠলেন টেল রাজার কথায়।

এ কি সাংঘাতিক পরীক্ষা নিতে চাইছেন তিনি। মাথার ওপরে এটুকু একটা আপেলকে তীরবিদ্ধ করা তো সহজ কাজ নয়। যে

কোন মুহূর্তেই তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হতে পারে। এখানে লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়া মানে, ছেলের মৃত্যু। আপেলের বদলে তীরটা গেঁথে যাবে তার মাথায়।

মা-মরা দশ বছরের এই ছেলেটিই টেল-এর চোখের মণি। এক মুহূর্তের জন্য কাছ-ছাড়া করেন না তাকে। তার বিপদের কথা ভেবেই টেল প্রহরীদের সঙ্গে লড়াই না করে আত্মসমর্পণ করেছেন। যে কারণে প্রহরীরা তাঁকে বিনা বাধায় এখানে বন্দী করে আনতে পেরেছে।

না, ছেলের মৃতুতে বাজি রেখে তিনি নিজের মুক্তি চান না।

রাজাকে বললেন সে কথা—না, না রাজা, এ কাজ আমি করতে পারব না। এমন মুক্তি আমি চাই না। আপনি আমায় মৃত্যুদণ্ড দিন।

এতক্ষণে রাজা তাঁর মনের আসল ইচ্ছে প্রকাশ করলেন। হেসে বললেন—না টেল, আমি তোমায় মারব না। তোমার চোখের সামনে মারব তোমার ছেলেকে।

টেল ভেবে পেলেন না, এখন কি করবেন। এ তো শাঁখের করাতের অবস্থা—যেতেও কাটে, আসতেও কাটে। তিনি নিজে ঐ তীর ছোঁড়ার পরীক্ষা দিতে রাজি না হলে রাজা তাঁর ছেলেকে হত্যা করবেন। কিছুতেই বাঁচানো যাবে না প্রিয় ছেলেকে।

মাথা যেন কাজ করতে চাইছে না আর। টেল মাথায় হাত দিয়ে হতাশভাবে মেঝেতে বসে পড়লেন।

গোটা রাজসভায় তখন অখণ্ড নীরবতা। টেল এখন কি করেন, তা দেখার জন্য সকলেই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন।

সকলকে অবাক করে নীরবতা ভাঙ্গল টেল-এর দশ বছরের ছেলে। এতক্ষণ সে সব কথা শুনেছে, সব কিছু দেখেছে—কিন্তু কোন মন্তব্য করে নি। এবার বাবাকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়তে দেখে সে এগিয়ে এল পিতার সাহস সঞ্চয় করতে। দৃপ্ত ভঙ্গিতে বলল—বাবা, তুমি পরীক্ষা দিতে রাজি হচ্ছ না কেন? আমি দেখেছি তীর ছোঁড়ার সময় তোমার হাত কখনও কাঁপে না, আজও আমি নিশ্চিত, কাঁপবে না।

ছেলের তেজোদীপ্ত ভঙ্গি দেখে টেল তার হারানো সাহস আবার ফিরে পেলেন। রাজাকে বললেন—নিয়ে আসুন আপেল, দেখি চেষ্টা করে।

টেল-এর ছেলের মাথায় বসানো হল আপেলটিকে। একশো হাত দূরে গিয়ে দাঁড়ালেন টেল। চারদিক একবার দেখে নিলেন ভালো করে। তারপর তূণ থেকে দুটি তীর তুলে নিলেন।

ছেলে তেমনি নির্ভয়ে শান্ত ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। দেখে টেল-এর মনে আর কোন দ্বিধা বা জড়তা রইল না।

লক্ষ্য স্থির করে একটি তীর ছুঁড়লেন টেল।

অব্যর্থ নিশানা আপেলটি দু-আধখানা হয়ে দু পাশে ছিটকে পড়ল। ছেলেটি তেমনি দাঁড়িয়ে, তার কিছুই হয় নি।

গোটা রাজসভা ধন্য ধন্য করে উঠল। সত্যিই টেল-এর জুড়ি নেই।

এগিয়ে গিয়ে টেল ছেলেকে দু হাতে জড়িয়ে ধরলেন। বাঁধনহারা আনন্দ তখন তাঁর মনে। আজ তাঁর লক্ষ্যভেদ সত্যিই সার্থক। আনন্দের আবেগে তাঁর মুখ দিয়ে একটি কথাও বেরোল না, শুধু দু চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল।

পিতার কৃতিত্বে ছেলেও তখন গর্বিত। পিতাকে দু হাতে জড়িয়ে ধরে সে উল্লাসের সুরে বলল—আমি জানতুম বাবা, তুমি পারবে।

পিতা-পুত্রের এই অবিস্মরণীয় মিলনদৃশ্য দেখতে রাজাও সিংহাসন ছেড়ে এগিয়ে এসেছিলেন ওঁদের সামনে। টেল-এর আশ্চর্য লক্ষভেদ তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। প্রতিহিংসাপরায়ণতা তাঁর মন থেকে তখন উধাও হয়ে গিয়েছিল, পরিবর্তে টেল-এর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠেছিলেন। তিনি টেলের পিঠে হাত রেখে তাই বললেন—সত্যিই তুমি বীর, এ দেশের শ্রেষ্ঠ তীরন্দাজ। তুমি দেশের গর্ব, তোমার মত বীরকে আটকে রাখার অধিকার আমার নেই। আজ থেকে তুমি মুক্ত যেখানে ইচ্ছা তুমি যেতে পার।

টেল বীর। মানুষকে তাঁর যোগ্য সম্মান দিতে পারেন। রাজা কঠোর পরীক্ষা নিলেও টেল তাই এতটুকু ক্ষুব্ধ হলেন না রাজার ওপর। বললেন—রাজা, আপনি সত্যিই যথার্থ রাজা। শোনা কথায় আপনি বিশ্বাস করেন নি, চোখের সামনে আমার বীরত্বকে যাচাই করে নিয়েছেন। আপনার কাছে এভাবে পরীক্ষা দিতে না হলে আমিও নিজেকে জানতে পারতুম না। আপনি আমার সশ্রদ্ধ অভিবাদন গ্রহণ করুন। এ দেশ ছেড়ে আমি কোথাও যাব না, আপনার অধীনেই কাজ করতে পারলে আমি খুশি হব।

এতক্ষণের রুদ্ধ আবেগকে আর আটকে রাখতে পারলেন না রাজা। টেলকে গভীর আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে বললেন—তোমার মত বীরকে পেলে আমার সেনাবাহিনী গর্ব অনুভব করবে। তুমি আমৃত্যু আমার সেনাবাহিনীতে থাকবে। কিন্তু টেল, তীর ছোঁড়ার আগে তোমার একটা আচরণের অর্থ আমি বুঝতে পারি নি। তুমি তুণ থেকে একটার বদলে দুটো তীর তুলে নিয়েছিল কেন?

গম্ভীর স্বরে টেল জবাব দিলেন—আপনার কথা রাখতে নিজের প্রাণের প্রিয় ছেলের জীবনকে বাজি রেখেছিলাম আমি। সতর্কতা হিসাবে তাই তুলে নিয়েছিলাম দুটো তীর। প্রথম তীরটি লক্ষ্যচ্যুত হবে দ্বিতীয় তীরটা ছুড়তাম আমি। সেটি অব্যর্থ নিশানায় আপনার বুকে বিদ্ধ হতো।

টেল-এর এই স্পষ্ট কথায় রাজা ক্রুদ্ধ না হয়ে বরং খুশিই হলেন। টেলকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন—তুমি সার্থক পিতা ধন্য তোমার পুত্রস্নেহ। তোমার মত পিতা পেয়েছে বলে তোমার পুত্র সত্যিই ভাগ্যবান।

আত্মজ্ঞান

[নিজেকে জানাই পৃথিবীর সবচেয়ে কঠিন কাজ। নিজেকে যিনি জানতে পারেন, তাঁর মন থেকে সব মোহ চলে যায়। তাঁর আত্ম পর জ্ঞান দূর হয়, সকলকেই এক দেখেন তিনি। একটি সুন্দর গল্পের উল্লেখ করে অনুগামীদের সেই কথা বুঝিয়ে দিলেন বিবেকানন্দ।]

নদীর ধারে ছোট্ট একটি গ্রাম।

ছোট বলে কি হয়, গ্রামটির শোভা চোখকে টানে। খড়ের ছাউনি দেওয়া ছোট ছোট কুঠির। তাদের ঘিরে আম-কাঠালের বাগান, মাঠে সোনার ফসল। নানা জাতের পাখির মধুর কলকাকলি ঘুম জাগায় গ্রামবাসীদের, আম জাম বটগাছের ফাঁক দিয়ে হাওয়ার মত নাচন তাদের মনে খুশির বন্যা বইয়ে দেয়, গ্রামের কোন আঁকাবাঁকা নদীর শান্ত জলরাশির মৃদুমন্দ কুলুকুলু শব্দ যাবতীয় অপূর্ণতাকে পূর্ণ করে দেয়।

সুখেই আছে গ্রামবাসীরা। তাদের চাহিদা কম, অল্পে সন্তুষ্ট, তাই তারা সুখী।

সেই গ্রামে ছিল একটা মঠ। সেখানে থাকতেন সন্ন্যাসীরা। তারা গ্রামবাসীদের সঙ্গেও যোগাযোগ রাখতেন, গ্রামবাসীরাও অবসর সময়ে ঐ মঠে গিয়ে ধর্মালোচনা করত।

এই আদানপ্রদানের ফলে মঠের সন্ন্যাসীদের সঙ্গে গ্রামবাসীদের একটা সুন্দর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল।

বেশ চলছিল সব কিছু। হঠাৎ একদিন একটা অঘটন ঘটল।

ঐ মঠের এক সাধু একদিন ভিক্ষা করতে গিয়েছিলেন পাশের

গ্রামে। এদিক ওদিক ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ তার নজরে পড়ল, একজন বেশ রাশভারি লোক আর একজনকে ধরে চাবুক দিয়ে খুব মারছে। লোকটা মার খেয়ে খুব চেঁচাচ্ছে, তার সারা শরীর রক্তাক্ত হয়ে গেছে—তবু তাকে রাশভারি লোকটা ছাড়ছে না। একটু তফাতে দাঁড়িয়ে বেশ কয়েকজন লোক ঐ দৃশ্য দেখছে, কিন্তু কেউই কিছু বলছে না।

সাধুর মনে কিন্তু দয়া জেগে উঠল। হাজার হোক, সাধু তো—নরম মন, পরের দুঃখকষ্টে মন কেঁদে ওঠে। আশেপাশের লোকদের জিজ্ঞেস করলেন, ব্যাপারটা কি। তারা জানাল, ঐ রাশভারি লোকটি হল ঐ গ্রামের জমিদার, আর যে লোকটি মার খাচ্ছে, সে একজন চোর। জমিদারবাবুর বাড়িতে চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়েছে। তাই জমিদারবাবু ওকে মারছেন।

সাধুর মন থেকে এ কথা শোনার পরেও কিন্তু দয়া গেল না। চোরের নিশ্চয়ই শাস্তি হওয়া উচিত, কিন্তু তা বলে এমন নিষ্ঠুর মার? আহা, লোকটা মরে যাবে যে!

সাধু আর থাকতে পারলেন না। এগিয়ে গেলেন জমিদারের সামনে। বললেন—আহা, এভাবে মারছেন লোকটাকে, মরে যাবে যে! অন্যায় করেছে, পুলিশে দিন, কিন্তু এভাবে মারাটা খুব অন্যায়।

জমিদারবাবু মেজাজী রাশভারি লোক। কখনও কারুর কাছ থেকে বাধা পেতে অভ্যস্ত নন। এতগুলো লোক দাঁড়িয়ে, তারা কেউ কিছু বলছে না, হঠাৎ সাধুবেশী এই লোকটা এসে উপদেশ দিতে শুরু করল!

মার থামিয়ে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে সাধুর দিকে তাকালেন জমিদারবাবু। বললেন—আমাকে জ্ঞান না দিয়ে নিজের কাজ কর গিয়ে।

সাধু বললেন—আজ্ঞে, তা তো নিশ্চয়ই করব। কিন্তু দোহাই আপনার, লোকটাকে এভাবে মারবেন না।

জমিদারবাবুর আর সহ্য হল না। বললেন—ফের উপদেশ? তাহলে সাধুর বেশে তুই ব্যাটা নিশ্চয়ই চোরের সাকরেদ। ওরে, ধর দেখি ব্যাটাকে, ওকেও দু-চার ঘা কসিয়ে দিই।

অনুচররা তৈরি হয়েই ছিল।

জমিদারবাবু বলতে না বলতেই তারা সাধুকে জাপটে ধরে হিড় হিড় করে টানতে টানতে জমিদারবাবুর সামনে নিয়ে এল।

তারপর শুরু হল মার। শুধু জমিদারবাবু নয়, তার অনুচররাও সাধুকে এলোপাথাড়ি কিল-চড়-ঘুষি মারতে লাগল। নিরীহ সাধু আর কতক্ষণ তা সহ্য করবেন? তিনি জ্ঞান হারালেন।

তাকে লুটিয়ে পড়তে দেখে জমিদারবাবু ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের তখন খেয়াল হল, মারটা বেশিই হয়ে গেছে। লোকটা যে আর নড়াচড়া পর্যন্ত করছে না—মরে গেল নাকি? তাহলে তো পুলিশ-মামলা-মোকদ্দমার ঝামেলা। তার আগে সরে পড়াই ভালো।

চেতনাশূন্য সাধুকে রক্তাক্ত অবস্থায় ঐভাবে পথের উপর ফেলে রেখে তারা সবাই ওখান থেকে সরে পড়লেন।

এই ঘটনার বেশ খানিকটা সময় পরে সাধুজীর গ্রামের এক তাঁতী যাচ্ছিল ঐ পথ দিয়ে। সাধুকে রক্তাক্ত অবস্থায় ঐভাবে পথে পড়ে থাকতে দেখে সে চমকে উঠল। তখুনি নিজের গ্রামে গিয়ে ঐ মঠে খবর দিল—আপনাদের মঠের একজন সাধু পাশের গ্রামের বড়দীঘির পাশে বটগাছের দিকে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছেন। জ্ঞান নেই।

কি হয়েছিল? অচৈতন্য হয়ে গেলেন কেন?

লোকটি বলল—জানি না। ঐ পথ দিয়ে আসতে আসতে হঠাৎ দেখলুম। তবে দেখে মনে হল, কেউ খুব মেরেছে। সারা গায়ে আর মুখে মারের দাগ, কালশিরে পড়ে গেছে বহু জায়গায়।

মঠের সবাই হন্তদন্ত হয়ে ছুটলেন সেখানে। সাধুজীকে খুব সাবধানে নিয়ে এলেন মঠে।

সেবাশুশ্রূষা চলতে লাগল। অনেকক্ষণ পরে সাধুর জ্ঞান হল। চোখ মেলে তাকালেন তিনি।

মঠের আর এক সাধু তা দেখে একটু দুধ গরম করে এনে সাধুজীকে খাওয়াতে লাগলেন।

দুধ খাওয়াতে খাওয়াতে তিনি জিজ্ঞেস করলেন—আপনাকে কে মেরেছে ?

ঘরে তখন আরও অনেক লোক। তারা উৎকর্ণ হয়ে ছিল। একবার নামটা জানতে পারলে হয়, তারপর নিরীহ একজন সাধুকে এমন নির্দয়ভাবে প্রহার করার মজা দেখিয়ে দেবে।

সাধুজী কিন্তু কোন উত্তর না দিয়ে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন।

দুধ খাওয়াতে থাকা সাধু আবার জিজ্ঞেস করলেন—বলুন, কে আপনাকে এমনভাবে মারল।

এবার মুখ খুললেন সাধুজী। বললেন—আমাকে যিনি এখন দুধ খাওয়াচ্ছেন, তিনিই কিছুক্ষণ আগে আমাকে মেরেছেন।

আশ্চর্য হয়ে গেল সবাই সাধুর কথা শুনে। নিশ্চিত পাগল হয়ে গেছেন তিনি, নইলে এমন কথা কেউ বলে ?

সাধুজী অবশ্য ঠিক কথাই বলেছেন। এতদিনে আত্মজ্ঞান লাভ হয়েছে তার, তাই সকলের মধ্যে একই আত্মাকে দেখলেন তিনি। ভেদজ্ঞান লুপ্ত হল তার, তিনি বুঝলেন, যিনি মেরেছেন আর যিনি দুধ খাওয়াচ্ছেন তাদের দুজনের চেহারা আলাদা বটে, কিন্তু দুজনের শরীরে একই আত্মা বিরাজ করছেন, তাই এতটুকু পার্থক্য নেই ওঁদের মধ্যে।

অগস্ত্য মুনির দৈত্য দমন

[পুরাণ ভারতের শাশ্বত সম্পদ। ভারতবর্ষের সনাতন রূপটিকে দেখতে হলে পুরাণ পড়তেই হবে। বিবেকানন্দও পুরাণের খুব ভক্ত ছিলেন। বহু জায়গায় তিনি পুরাণ কাহিনীর উল্লেখও করেছেন। একদিন অগস্ত্য মুনির প্রসঙ্গ উঠলে বিবেকানন্দ তাঁর অনুগামীদের অগস্ত্য মুনির দৈত্য দমনের কাহিনী শোনালেন।]

প্রাচীন ভারতের মুনিঋষিদের মধ্যে অগস্ত্য মুনির বেশ নামডাক ছিল। ব্রহ্মজ্ঞানী এই ঋষি অনেক আশ্চর্য কাণ্ড করছেন।

রাম-লক্ষ্মণ তখন দণ্ডকারণ্যে। বনবাস-জীবন কাটাচ্ছেন। রাজ-প্রাসাদের ভোগবিলাস ছেড়ে শান্ত-নিরুত্তাপ বনের জীবন তাঁদের খারাপ লাগছিল না। দণ্ডকারণ্যে তখন বহু মুনি-ঋষির আশ্রম। রাম-লক্ষ্মণ তাদের সঙ্গে দেখা করেছিলেন।

রাম-লক্ষ্মণের মত বিনয়ী ও বিদ্বান দুই ভ্রাতাকে পেয়ে মুনিরাও খুব খুশি। তারা তো ওঁদের ছাড়তেই চান না। যে ঋষির কাছে ওঁরা যান, তার কাছেই সেই একই অবস্থা। যার সঙ্গে শুধু দেখা করে বেরিয়ে আসার কথা, তার তপোবনে থাকতে হয় পাঁচদিন। আবার যাঁর কাছে থাকার কথা পাঁচদিন, তার কাছে কেটে যায় পাঁচ মাস। এভাবে মুনিঋষিদের তপোবন ঘুরতে ঘুরতেই কেটে গেল বেশ কয়েকটা বছর।

রাম-লক্ষ্মণ অগস্ত্য মুনির কথা বহুদিন আগেই শুনেছিলেন। মুনিশ্রেষ্ঠর সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছাও তাদের প্রবল হয়ে উঠেছিল। অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন মুনি। এক চুমুকে গোটা সমুদ্র পান করে

ফেলেছিলেন। আরও ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছিলেন ইল্বল আর বাতাপি নামে দুই সাংঘাতিক দৈত্যকে বধ করে।

মুনিরা সেই আশ্চর্য কাহিনী শোনালেন রাম-লক্ষ্ণণকে।

ইল্বল আর বাতাপি ছিল দুই ভাই। দুজনেই সমান দুর্জন। সৎ জীবনযাত্রার চেয়ে অসৎ জীবনযাত্রাতেই দুজনের আগ্রহ। এমন কোন পাপ কাজ নেই যা তারা করে নি। বিশেষ করে ব্রাহ্মণ হত্যায় ওদের আগ্রহ যেন ছিল সবচেয়ে বেশি।

ওদের ব্রাহ্মণ-হত্যার পদ্ধতিটি ছিল অভিনব।

শ্লোক আওড়াতে আওড়াতে তারা যেত ব্রাহ্মণদের বাড়িতে। তাদের বলত—আমাদের বাবা মারা গিয়েছেন, সেই উপলক্ষ্যে এক শ্রাদ্ধকর্মের আয়োজন করেছি। সেই আয়োজনে আপনার নিমন্ত্রণ রইল, আপনি পায়ের ধুলো দিলে আমরা কৃতার্থ হব।

ব্রাহ্মণরা সকলেই নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে ওদের বাড়ি যেতেন। বাতাপি-ইল্বলের ভাবভঙ্গি, আচার-আচরণ দেখে বা কথাবার্তা শুনে একবারের জন্যও ওঁদের মনে হতো না, নিমন্ত্রণের গোটা ব্যাপারটাই মিথ্যে। আসলে ছল করে ওরা ব্রাহ্মণদের নিজেদের বাড়িতে নিয়ে যেতে চাইছে।

বাড়িতে ঢোকার পরেও ব্রাহ্মণ বুঝতে পারতেন না ওদের ছলনা। যথারীতি শ্রাদ্ধবাড়ির আয়োজন। ইল্বল বিনম্রভাবে ব্রাহ্মণকে অভ্যর্থনা জানিয়ে বসতে দিত। একটু পরেই খাওয়ার ডাক পড়ত ব্রাহ্মণের। কচি ভেড়ার মাংস খেতে দিত ইল্বল। কি সুন্দর ঘ্রাণ তার! ক্ষুধার্ত ব্রাহ্মণের আর তর সইত না, তিনি দ্রুত সেই সুস্বাদু মাংস খেতেন।

খাওয়া শেষ হবার পরে ইল্বল আসল কাজে নামত। ব্রাহ্মণ প্রকৃত ব্যাপারের তখনও কিছুই জানতেন না। জানতেন না, যে ভেড়ার মাংস তিনি খেলেন সেটি প্রকৃত ভেড়া নয়—আসলে ওটি হল

মায়াবী দৈত্য বাতাপি। ইল্বলের কায়দায় ব্রাহ্মণের মুখের ভেতর দিয়ে ঢুকে পড়েছে তার শরীরের ভেতরে।

যে জানত, সেই ইল্বল ব্রাহ্মণের খাওয়াদাওয়ার পর তার পাশে গিয়ে বসত। শুতে দিত ব্রাহ্মণকে। যেই তিনি শুতেন, অমনি ইল্বল 'বাতাপি, বাতাপি, বেরিয়ে আয়' বলে ডাক শুরু করত। বাতাপি তৈরি হয়েই থাকত। সে ডাক শোনা মাত্র ভেড়ার মত ভ্যা ভ্যা করতে করতে ব্রাহ্মণের পেট চিরে বেরিয়ে আসত। বেচারী ব্রাহ্মণের ভবলীলা সাঙ্গ হতো তখুনি।

এভাবে যে কত ব্রাহ্মণকে শেষ করেছিল ইল্বল আর বাতাপি, তার ইয়ত্তা ছিল না।

সরল ব্রাহ্মণরা প্রথম দিকে কিছুই বুঝতে পারেন নি।

তারপর ওঁদের খেয়াল হল, যে ব্রাহ্মণ খান, তিনি আর ফিরে আসেন না। তখন তাঁরা অনুমান করলেন, নিশ্চয়ই এর পেছনে কোন মায়াবী দৈত্য বা রাক্ষসের ছলনা আছে। এ নিয়ে ব্রাহ্মণদের মনে দারুণ ভীতির সঞ্চার হল। কেউ আর শ্রাদ্ধবাড়িতে যেতে চান না। কিন্তু মৃতের আত্মার শান্তির জন্য শ্রাদ্ধকাজ তো করতেই হবে, আর কাজটা করার দায়িত্ব ব্রাহ্মণদেরই। তাঁরা যেতে না চাইলে মানুষের আত্মা যে অতৃপ্ত রয়ে যাবে।

ব্যাপারটার একটা নিষ্পত্তি হওয়া দরকার। কে এর নিষ্পত্তি করতে পারেন? অনেক ভাবনাচিন্তার পর ব্রাহ্মণরা স্থির করলেন, তাঁরা অগস্ত্য মুনির কাছে যাবেন। একমাত্র তিনিই শোচনীয় পরিণতির হাত থেকে ব্রাহ্মণদের বাঁচাতে পারেন।

উদ্বিগ্ন ব্রাহ্মণদের মুখ থেকে সব কথা শুনে অগস্ত্য মুনিও চিন্তিত হয়ে পড়লেন। কে বা কারা ছলনা করছে, তা জানা যাচ্ছে না। অথচ কিছু করতে হলে দুষ্কৃতকারীদের নামটাই আগে জানা প্রয়োজন।

ধ্যানে বসলেন অগস্ত্য। তিনি ব্রহ্মজ্ঞানী ঋষি। ধ্যানে বসে জগৎসংসারকে দেখতে পান। এখনও দেখলেন এ কাজ মাত্র মায়াবী

দুরাত্মা দুই দৈত্য ইল্বল আর বাতাপির। নিরীহ অসহায় ব্রাহ্মণদের ডেকে নিয়ে গিয়ে এভাবে তাঁদের হত্যা করা? ক্রোধে দু চোখ জ্বলে উঠল অগস্ত্যের। যে কোন ভাবে হোক, দুরাত্মাদের চরম শিক্ষা দিতেই হবে।

অগস্ত্য মুনিকে ডাকতে হল না, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে তিনি নিজেই গেলেন ইল্বল-বাতাপির বাড়ি। ইল্বলকে বললেন—আমি ক্ষুধার্ত, আমায় মাংস খাওয়াও।

ইল্বল তো মুনিকে দেখে মনে মনে খুব খুশি। বেশ কিছু দিন কোন ব্রাহ্মণকে পাওয়া যায় নি, আর এই মুনি নিজেই এসেছেন, মাংস খেতে চাইছেন!

ইল্বল খুব সমাদর করে অগস্ত্যকে ঘরে বসাল। মায়াবী বাতাপিকে কেটে তার মাংস রান্না করে তাকে খেতে দিল।

অগস্ত্য ঠিক এই সুযোগেরই প্রতীক্ষায় ছিলেন। ইল্বল বাতাপির মাংস তাকে দেওয়া মাত্র তিনি ওকে খেয়ে তখুনি হজম করে ফেললেন।

ইল্বল তো আর তা জানে না। সে খাওয়ার পর যথানিয়মে বাতাপিকে ডাক দিল—বাতাপি, বাতাপি, বেরিয়ে আয়!

অন্য দিন বাতাপিকে ডাক দেওয়া মাত্র সে ভ্যা ভ্যা করতে করতে ব্রাহ্মণদের পেট চিরে বেরিয়ে এসেছে, কিন্তু আজ ইল্বল দেখল, মুনি শুয়ে আছেন মহানন্দে, মুচকি মুচকি হাসছেন, আর বাতাপির কোন সাড়াই নেই।

আশ্চর্য হয়ে সে আবার ভাইকে ডাকল—কি রে বাতাপি, শুনতে পাচ্ছিস না আমার ডাক? বেরিয়ে আয়!

কোথায় বাতাপি?

ইল্বল অবাক হয়ে মুনির দিকে তাকালেই অগস্ত্য হেসে উঠলেন—আজ আর বাতাপি বেরোবে না। ওকে হজম করে ফেলেছি।

ইল্বল তো কথাটা শুনেই ক্রোধে অন্ধ হয়ে মুনিকে মারতে গেল। অগস্ত্য জানতেন, এমন ঘটনা ঘটবে। তিনি তৈরি হয়েই ছিলেন। ইল্বল তার দিকে এগিয়ে আসতেই তিনি উঠে বসে ওর দিকে তাকালেন। আগুন-ঝরানো দৃষ্টি। ইল্বল তা সইতে পারল না, সঙ্গে সঙ্গে সে পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

দিকে দিকে রটে গেল সেই বার্তা।

ব্রাহ্মণরা তো ইল্বল-বাতাপি নিধনের খবর পেয়ে আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠলেন। স্বর্গ থেকে দেবতারাও নেমে এসে সেই আনন্দোৎসবে যোগ দিলেন।

তরুণ রাম-লক্ষ্মণকে মুনিরা শোনালেন এই আশ্চর্য কাহিনী। অভিভূত দু ভাই এরপর দেখা করলেন অগস্ত্যের সঙ্গে।

ওঁদের দেখা পেয়ে অগস্ত্য নিজেও কম খুশি হলেন না। তিনি রামকে দিলেন বিশ্বকর্মার তৈরি একটি ধনুক, ব্রহ্মদত্ত নামে একটি ভয়ঙ্কর বাণ, আর অক্ষয় নামে একটি তূণ। তূণটির একটি আশ্চর্য গুণ ছিল। এর ভেতরের তীর কিছুতেই ফুরতো না, তাই এর নাম দেওয়া হয়েছিল অক্ষয় তূণ।

মুনিবরের কাছ থেকে জিনিসগুলি নিয়ে রাম অগস্ত্যকে বললেন—মুনিবর, আপনি এই বনে আমাদের একটা সুন্দর জায়গা দেখিয়ে দিন, আমরা সেখানে ঘর বেঁধে শান্তিতে থাকব।

অগস্ত্য একটু চিন্তা করে বললেন—এখান থেকে দুই যোজন দূরে পঞ্চবটী নামে এক সুন্দর বন আছে। ফলমূল ও মিষ্টি জলের অভাব নেই সেখানে, বিচিত্র পশুপাখি সেই বনে খেলা করে বেড়ায়। পঞ্চবটীর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তোমাদের চোখ জুড়িয়ে দেবে, তোমরা সেখানেই গিয়ে বসবাস করতে শুরু কর।

অগস্ত্য মুনির কথা রাম শুনেছিলেন। তার কথা শুনতে গিয়েই রাক্ষসরাজ রাবণের সঙ্গে রামের সংঘর্ষ বেঁধেছিল। পঞ্চবটী বনে রাম-লক্ষ্মণ-সীতার শান্তিতে থাকার চেষ্টায় বাদ সাধলেন প্রথমে শূর্পনখা, তারপর মারীচ—সবশেষে রাবণ এসে সীতাকে হরণ করে নিয়ে গেলেন। শুরু হল রামের জীবনের এক নতুন অধ্যায়, যার পরিণতি রাম-রাবণের যুদ্ধে এবং রাক্ষসরাজের ধ্বংসে। যে আরব্ধ কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য ভগবান বিষ্ণুর রামরূপে মর্ত্যে আগমন, সেই কাজের শুরু পঞ্চবটী বন থেকেই।

সত্যাশ্রয়া সত্যকাম

[মানুষের পরম ধর্ম হল সত্যকে অনুসরণ করা। এই কাজে অনেক সময় বিপদ আসে, প্রত্যাশিত ফল পাওয়া যায় না—কিন্তু এসবে হতাশ বা নিরাস না হয়ে সত্যকে অনুসরণ করলে একদিন না একদিন জয় হবেই। অনুগামীদের জবালা সত্যকামের কাহিনী শুনিয়ে বিবেকানন্দ তাঁদের বোঝাতে চাইলেন, সত্য থেকে যিনি ভ্রষ্ট হন না, তাঁর জয় অবধারিত।]

প্রাচীন ভারতে ছাত্রদের শিক্ষা দেবার ভার ন্যস্ত ছিল ত্যাগী ও অপরিসীম জ্ঞানের অধিকারী ঋষিদের উপর। বিদ্যার্থীরা তাঁদের কাছে আসতেন ছোট বয়সে, গুরুগৃহে থেকে বিদ্যাচর্চার সঙ্গে গুরুর সেবাযত্ন করতেন, তারপর এক সময় জ্ঞানলাভ সমাপ্ত হলে নিজের ঘরে ফিরে এসে বিয়ে করে সংসারী হতেন। এভাবে প্রাচীন ভারতের ঋষিদের আশ্রম হয়ে উঠেছিল সত্যকারের মানুষ গড়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র।

ব্রহ্মজ্ঞানী ঋষি গৌতমের এমন একটি আশ্রম ছিল। সাধক হিসেবে যেমন, অধ্যাপক হিসেবেও তেমনি গৌতমের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল দেশের সর্বত্র। তাই দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিদ্যার্থীরা তাঁর কাছে শিক্ষালাভ করার জন্য আসত।

বালক সত্যকামও ঋষি গৌতমের আশ্রমের কথা শুনেছিল। ভারি ইচ্ছে হল তার ওখানে গিয়ে শিক্ষালাভ করার। আশ্রমে যাবার মত বয়সও হয়েছে তার।

মনের বাসনা কাকে প্রকাশ করা যায়? মা ছাড়া বাড়িতে আর কেউ নেই। আর, সন্তানের কাছে মা-ই তো সবচেয়ে আপন জন।

সত্যকাম তাই মাকেই একদিন জানাল—আমি গৌতমের আশ্রমে গিয়ে বিদ্যার্জন করতে চাই।

ছেলে লেখাপড়া শিখে জ্ঞানী হতে চাইছে, এর চেয়ে আ·ন্দের কথা আর কি হতে পারে। শুনে মায়ের তো প্রাণ জুড়িয়ে গেল। মা জবালা বললেন—এ তো ভালো কথা। তুমি নিশ্চয়ই যাবে গৌতমের কাছে।

ছেলে তো খুব খুশি।

কিন্তু তারপরেই তার মনে হল, আশ্রমে ভর্তি হবার তো অনেক নিয়মকানুন আছে। ভর্তি করার আগে গুরু অনেক কথা জিজ্ঞেস করবেন—নাম কি, কোথায় থাকে, পিতার নাম কি, গোত্র কি, বাড়িতে কে কে আছেন ইত্যাদি। এসব প্রশ্নের যথাযথ উত্তর পেয়ে গুরু সন্তুষ্ট হলে তবেই আশ্রমে ভর্তি হওয়া যাবে।

সত্যকাম তাই মাকে জিজ্ঞেস করে—মা, আমার গোত্র কি ?

মা এবার সমস্যায় পড়লেন। সমাজে পিতার পরিচয়েই সন্তানের পরিচয়, পিতার গোত্রই ছেলের গোত্র। কিন্তু সত্যকামের পিতা কে, তা তো তিনি জানেন না। তাঁর বিবাহ হয় নি, তাই তাঁর পুত্রের পিতৃপরিচয় নেই—সে অবৈধ পুত্র হিসেবে গণ্য।

কিন্তু এ কথা তিনি কি করে বলবেন ছেলেকে ? ছেলে ভাববে কি ? যদি ছেলের কথা বাদই দেওয়া যায় তাহলে অন্য লোকেরাই বা কি ভাববে ? অবৈধ পুত্রের জননীকে যে সমাজ ঘৃণার চোখে দেখে।

এ রকম সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে কিছুক্ষণ নীরব রইলেন তিনি। মনে মনে বললেন, ঈশ্বর, এ কি কঠিন সঙ্কটে ফেললে তুমি আমায় ? ছেলেকে সত্যি কথা বললে চরিত্রহীন বলে প্রমাণিত হতে হয়, আবার মিথ্যে কথা বললে মিথ্যেবাদী হতে হয়। তিনি কি করবেন এখন ?

চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল জবালার। না, নিজের লজ্জা ঢাকতে তিনি মিথ্যার আশ্রয় নেবেন না। ছেলে যা ভাবে ভাবুক, ঋষি যাই ভাবুক, সমাজ যাই বলুক, তিনি সত্যি কথাই বলবেন। হয়ত এই

ধরনের সত্য কথা বলার পরিণাম মারাত্মক হবে। হয়ত গৌতম তাঁর ছেলেকে আশ্রমে নেবেন না, হয়ত ছেলের লেখাপড়াই শেখা হবে না।

যা হয় হোক। তবু জবালা মিথ্যে কথা বলবেন না।

স্থির দৃষ্টিতে জবালা ছেলেকে বললেন—বাবা, তোমার গোত্র কি, তা আমি জানি না। আমি দাসী ছিলাম, দাসীবৃত্তি নিয়ে বহু জায়গায় ঘুরেছি। অবিবাহিতা মায়ের কোলে তুমি এসেছো। আমার নাম জবালা। আমার নামেই তুমি নিজের পরিচয় দিও।

সত্যকাম আর কিছু না বলে ঋষি গৌতমের কাছে হাজির হলেন। ঋষিকে প্রণাম করে জানালেন, তিনি তাঁর কাছে শিক্ষা লাভ করতে চান।

বালক সত্যকামকে দেখে গৌতমের খুব ভালো লাগল। সস্নেহে তার মাথায় হাত বুলিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—তোমার নাম ?

সত্যকাম উত্তর দিলেন—সত্যকাম।

—কোথায় থাক ?

সত্যকাম সে প্রশ্নেরও জবাব দিলেন।

—তোমার পিতার নাম ?

সত্যকাম সত্যি কথাই বললেন—জানি না।

—তোমার গোত্র কি ?

আবার সত্যকাম সত্যি কথা বললেন—আমার গোত্র কি, তা আমি জানি না। আমার পিতৃপরিচয় নেই, তবে মাতৃপরিচয় আছে। আমার মায়ের নাম জবালা, আমি তাঁরই ছেলে।

আশ্রমে বসেই সত্যকামকে প্রশ্নগুলো করছিলেন গৌতম। সেখানে উপস্থিত ছিল আরও অনেক শিক্ষার্থী। তারা সত্যকামকে ঐভাবে সত্যি কথা বলতে শুনে খুবই আশ্চর্য হল।

যার পিতৃপরিচয় নেই, সেই জারজ সন্তান এসেছে গৌতমের মত ঋষির কাছে শিক্ষালাভ করতে ? এমন ছেলেকে নিশ্চয়ই গুরু আশ্রমে

প্রবেশের অধিকার দেবেন না। অপূর্ণ থেকে যাবে সত্যকামের মনের বাসনা।

গুরু এবার কি করেন, তা দেখার জন্য আশ্রমের বিদ্যার্থীদের মনে তখন অসীম কৌতূহল।

কিন্তু সকলকে অবাক করলেন গৌতম। উঠে গিয়ে বালক সত্যকামকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন—বালক, লোকলজ্জার পরোয়া না করে তুমি যেভাবে সত্যি কথা বলে নিজের পরিচয় দিয়েছ, তাতেই প্রমাণ হয়ে গেছে, তুমি শ্রেষ্ঠ গোত্রীয়, তুমি ব্রাহ্মণ। সব রকম বিপদ আপদকে তুচ্ছ জ্ঞান করে যে সত্যকে আশ্রয় করে থাকে, দেবতা তার সহায় হন। তোমার সত্যবাদিতায় আমি মুগ্ধ, তাই তোমাকে আমার আশ্রমের শিক্ষার্থী করে নিলাম। তুমি সমিধ আহরণ করে আনো।

সত্যকামের দু চোখ বেয়ে আনন্দের অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। ঋষি গৌতমকে আবার প্রণাম করে বলল—আশীর্বাদ করুন ঋষি, আমি যেন চিরকাল সত্যকে আশ্রয় করে থাকতে পারি।

জড়ভরতের উপাখ্যান

[পাশ্চাত্যের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে ভারতীয় চিন্তাধারার প্রভেদ অনেক। পাশ্চাত্য বস্তুকে প্রাধান্য দেয়, বস্তুকেই সর্বস্ব মনে করে নানা জিনিস পাওয়ার জন্য লালয়িত হয়ে ওঠে। আর, ভারতীয়রা বস্তুকে মনে করে অসার। তারা জানে, প্রতিটি জিনিসেরই মৃত্যু বা ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী—তাই বস্তুকে অহেতুক প্রাধান্য না দিয়ে ভারতীয়রা আত্মার শুদ্ধতার উপরে জোর দেয়। কারণ তারা জানে সব জিনিসের ধ্বংস আছে, শরীরের মৃত্যু আছে কিন্তু আত্মার ধ্বংস বা মৃত্যু নেই —সেঅবিনাশী। আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়ার এক আসরে ভারতীয়দের দৃষ্টি ভঙ্গি সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বিবেকানন্দ তাঁর অনুগামীদের জড়ভরতের উপাখ্যানটি শোনালেন।]

প্রাচীন ভারতবর্ষে ভরত নামে এক পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন। গোটা ভারতবর্ষকে তিনি নিজ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। তাঁরই নাম অনুসারে এই দেশের নাম হয়েছিল ভারত।

রাজা ভরত এক সময়ে বৃদ্ধ হলেন।

সেই সময়ে ভারতবর্ষে নিয়ম ছিল, একটা নির্দিষ্ট বয়স পেরিয়ে যাবার পর প্রতিটি মানুষকেই সংসার ও কর্মজীবন ত্যাগ করে বনে গমন করতে হবে, বাণপ্রস্থ অবলম্বন করতে হবে। গৃহ কর্ম শেষ, এবার ঈশ্বরচিন্তা। বনের শান্ত পরিবেশে বসে কেবলমাত্র ঈশ্বরের চিন্তায় মনপ্রাণ নিয়োজিত করতে হবে। মন বসলে গ্রহণ করতে হবে সন্ন্যাস। ঈশ্বরকে পাওয়ার চেষ্টাই হবে তখন একমাত্র সাধনা।

রাজা ভরতও সেই নিয়ম অনুসরণ করে পুত্রকে সিংহাসনে বসিয়ে বনে গেলেন। পেছনে পড়ে রইল রাজপ্রাসাদের বিলাসবাহুল্য, রত্নখচিত বহুমূল্য রাজসিংহাসন, লক্ষ লক্ষ প্রজাকে শাসন করার সুখস্মৃতি তিনি হিমালয়ের এক নির্জন অরণ্যে গাছের ডালপালা নিয়ে নিজের হাতে একটি কুটির তৈরী করে বনের ফলমূল খেয়ে দিনযাপন করতে লাগলেন। এই জগতের হেতুভুত কারণ যিনি, জগৎসংসার যাঁর

অঙ্গুলিহেলনে চলছে, তাঁকে জানার চেষ্টাতেই তাঁর বাকি সময় অতিবাহিত হতে লাগল।

এভাবে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর কেটে গেল রাজা ততদিনে আরও বৃদ্ধ হয়েছেন, তাঁর মন থেকে সাংসারিক সমস্ত চিন্তা অন্তর্হিত হয়েছে, মায়া ও মোহের বন্ধনকে কাটিয়ে তিনি অবিনাশী শুদ্ধ আত্মার স্বরূপ দর্শন করছেন।

এমন সময় একদিন একটা ঘটনা ঘটল।

রাজা নদীতীরে একাকী বসে আছেন, দেখলেন এক পূর্ণগর্ভা হরিণী জল পান করার জন্য সেখানে উপস্থিত হল। নদীর পার থেকে একটু নিচে নেমে সে জলে মুখ দিতে যাবে, এমন সময় কোথা থেকে সিংহ এসে হাজির। হরিণীকে দেখেই সে গর্জণ করে উঠল।

সিংহটি এমন নিঃশব্দে ওখানে এসে হাজির হয়েছিল যে, হরিণী তার আগমনের বিন্দুবির্সগও টের পায় নি। এখন হঠাৎ তার গর্জনে হরিণী ভীষণ সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। শিয়রে মৃত্যু—হরিণী কি করবে তা ঠাওর করতে না পেরে উলটো দিকে নিচ থেকে উচুতে দিল লাফ। অনেকটা লাফ দেবার পরিশ্রম সইতে না পারায় সঙ্গে সঙ্গে তার মৃত্যু হল। সিংহও লাফ দিয়ে হরিণীর কাছে পড়ল, কিন্তু তাকে মৃত দেখে তখুনি সেই জায়গা ছেড়ে চলে গেল। মৃতা হরিণীর পাশে পড়ে রইল তার সদ্যপ্রসূত শাবকটি।

খানিকটা দূরে বসে রাজা পুরো ঘটনাটিই দেখলেন। কিন্তু গোটা ব্যাপারটা এত দ্রুত ঘটে গেল যে তিনি যে উঠে গিয়ে কিছু করবেন তারও উপায় ছিল না। সিংহ তার স্বভাব অনুযায়ী মৃত পশুকে না ছুঁয়ে যখন চলে গেল, তখন রাজা সচকিত হয়ে উঠলেন। তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলেন হরিণশাবকটির দিকে। বেচারী! জন্মমাত্রই মাকে হারাল!

হরিশিশুটির জন্য দুঃখে পরিপূর্ণ হয়ে গেল রাজার হৃদয়।

এগিয়ে গিয়ে তিনি শাবকটিকে কোলে তুলে নিলেন। আহা, কি সুন্দর দেখতে! ভীরু চোখ মেলে চারদিক দেখছে। বেচারী যদি জানত আগামী দিনে কত দুঃখকষ্ট তার জন্য অপেক্ষা করছে। মাতৃহারা সন্তানের তো প্রতিটি মুহূর্তই করুণ।

শাবকটির গায়ে হাত বোলাতে বোলাতে রাজার মন আরও বেদনার্ত হয়ে উঠল। এমন দুধের শাবককে এভাবে ফেলে রেখে চলে যাওয়া যায় না, উচিতও নয়। রাজা তখুনি ঠিক করলেন, শাবকটির লালন-পালনের ভার নেবেন, তার মায়ের অভাব নিজে পূরণ করবেন।

পরদিন থেকে রাজা প্রতিদিন কচি দূর্বাঘাস এনে হরিণশিশুটিকে খাওয়াতে লাগলেন। মায়ার বন্ধন ছাড়তে এককালে সংসার ত্যাগ করে তিনি বনে এসেছিলেন, এখন হরিণশাবককে ঘিরে আবার তাঁর মনে মায়ার বাঁধন সৃষ্টি হতে লাগল। কি যে হল, ঐ হরিণশিশুকে না দেখে এক মুহূর্ত তিনি থাকতে পারেন না। তাকে কিভাবে ভালভাবে বড় করে তোলা যায়, দিবারাত্র সেই চিন্তা।

ধীরে ধীরে হরিণশিশুটি বড় হয়ে উঠল। এখন আর তাকে ঘাস এনে খাওয়াতে হয় না, নিজেই মাঠে চরতে যায়, তবু তাকে নিয়ে রাজার চিন্তা। শিশুটির ফিরতে একটু দেরি হলে রাজা চিন্তিত হয়ে পড়েন, ভাবেন তার কোন বিপদ হয়েছে, কোন হিংস্র জন্তু তাকে আক্রমণ করেছে। নিজেই কুটির থেকে বেরিয়ে পড়েন পথে, ওকে খুঁজতে।

এভাবে কেটে গেল আরো অনেকগুলো বছর।

কালচক্রের নিয়মে একদিন রাজার মৃত্যুর সময় এগিয়ে এল। রাজা আর উঠতে পারেন না সেই নির্জন বনে একাকী অশক্ত দেহ নিয়ে শুয়ে থাকেন। পাশে থাকে সেই অবোধ হরিণটি। পালক পিতার প্রতি কর্তব্যবশত এক মুহূর্তের জন্যও সে তার কাছছাড়া হয় না। মৃত্যুকালেও হরিণটির জন্য রাজার অটুট মমতা। অসীম স্নেহে তিনি কেবল তাকিয়ে থাকেন ওরই দিকে।

দেখতে দেখতে এক সময় রাজার প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেল।

শরীরের বিনাশ আছে, কিন্তু আত্মা তো অবিনশ্বর। শরীরের মৃত্যু হয়; কিন্তু আত্মা তো থেকেই যায়। তাই এই জন্মের অবসানে রাজাকে আবার জন্ম নিতে হল। মৃত্যুর সময়ে তাঁর সমস্ত ভাবনাচিন্তা আবর্তিত হয়েছিল ঐ হরিণটিকে ঘিরে, তাই পরজন্মে তাঁর হরিণদেহ হল। তবু, ভরত যখন রাজা ছিলেন, কিংবা বনে যখন সন্ন্যাস জীবন যাপন করেছেন, তখন অনেক ভালো কাজ করেছিলেন, তার একটা পুণ্যফল তো নিশ্চয়ই ছিল। এই পুণ্যফলেই বাকশক্তি রহিত হয়েও এই হরিণটি হল জাতিস্মর। পূর্বজন্মের সব কথাই তার স্মৃতিপথে উদিত হলো।

মৃগরূপী রাজা ক্রমে নিজ সঙ্গীদের পরিত্যাগ করে যেতে শুরু করলেন ঋষিদের আশ্রমের কাছে। তার বাকশক্তি নেই, কিন্তু কান তো আছে। তিনি ঋষিদের আয়োজিত যাগযজ্ঞ দেখবেন, তাঁদের উচ্চারিত মন্ত্রগুলি শুনতেন। এভাবে হরিণ হলেও পূর্বজন্মের সুকৃতির বলে তিনি দেব-দ্বিজ সম্বন্ধে আগ্রহ দেখান।

কিন্তু পৃথিবীতে তো সবই নশ্বর। মৃগরূপী হরিণ এক সময়ে দেহত্যাগ করলেন। এবার তিনি জন্ম নিলেন ধনী ব্রাহ্মণের ঘরে, তাঁর বলিষ্ঠ পুত্ররূপে। আগের দুটি জন্মের সুকৃতিতে এ জন্মেও তিনি জাতিস্বর হলেন, পূর্বজন্মের যাবতীয় ঘটনা তাঁরস্মৃতি পথে জেগে উঠতে লাগল। এই জন্মে তাই সাংসারিক ভালো-মন্দ সম্বন্ধে আগ্রহ না দেখিয়ে অপেক্ষাকৃত উদাসীন অবস্থায় কাল কাটাতে লাগলেন। কোন সমস্যার জালে জড়িয়ে পড়েন, এই ভয়ে তিনি কারোর সঙ্গে বিশেষ কথা বলতেন না। এমন ভাব দেখাতেন সব সময় যে সবাই তাকে উন্মাদ ও জড় বলে অভিহিত করত। অনেকে তাকে বলত নির্বোধ।

এভাবে চারিদিকে নির্বোধ ও উন্মাদ হিসেবেই ভরতের নাম ছড়িয়ে পড়ল। লোকে তাই তাকে ডাকত 'জড়ভরত' বলে।

জড়ভরতের বেশ কয়েকটি ভাই ছিল। তারা ছিল রীতিমত সংসারী, বিষয়-আশয়ের প্রতি আগ্রহী। ছোট ভাইকে অমন নির্বোধ

দেখে তারা খুশিই হয়েছিল। জড়ভরতের বাবার সম্পত্তি ছিল প্রচুর —তাই দাদারা ঠিক করে ফেলেছিল, তারা জড়ভরতকে তার প্রাপ্য সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করবে।

এক সময়ে জড়ভরতের পিতার মৃত্যু হল। দাদারা তো তৈরি হয়েই ছিল। তারা জড়ভরতকে শুধু সম্পত্তি থেকেই বঞ্চিত করল না, তার সঙ্গে রীতিমত খারাপ ব্যবহার শুরু করে দিল। তাদের সঙ্গে যোগ দিল তাদের স্ত্রীরা। জড়ভরতকে তারা ঠিকমত খেতে দিত না, অকারণে খাটাত, আবার সুযোগ পেলেই তাকে আজেবাজে কথা বলত।

ক্রমে ক্রমে দাদাদের ও তাদের স্ত্রীদের দুর্ব্যবহারে জড়ভরত তিতি-বিরক্ত হয়ে পড়লেন। স্থির করলেন বাড়িতেই আর থাকবেন না। যেমন ভাবা তেমনি কাজ। জড়ভরত একদিন বাড়ি থেকে বেরিয়ে অনেকটা হেঁটে একেবারে নগরের বাইরে এলেন।

তখন দুপুরবেলা। আকাশে মধ্যাহ্ন সূর্যের প্রখর দীপ্তি। অনেকটা পথ একনাগাড়ে হেঁটে এসে জড়ভরত খুব ক্লান্তি অনুভব করলেন। বিশ্রাম নেবার জন্য তিনি এক বটগাছের ছায়ায় বসলেন।

ঠিক সেই সময় সেই দেশের রাজা পালকি চেপে ঐ পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। চারজন শক্তসমর্থ লোক পালকিটি বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ এদের মধ্যে একজন খুব অসুস্থ হয়ে পড়ল। সে আর পথ চলতে পারে না। বাধ্য হয়েই বাহারা পালকিটিকে মাটিতে নামাল।

হঠাৎ পালকির চলা থেমে যাওয়ায় রাজা একটু অবাকই হয়েছিলেন। পালকি থেকে মুখ বের করে একটু বিরক্তির সঙ্গেই বাহকদের জিজ্ঞাসা করলেন—কি হল, থেমে গেলে যে?

বাহকদের মধ্যে নেতা গোছের লোকটি বলল—হুজুর, বাহকদের মধ্যে একজন অসুস্থ হয়ে পড়েছে।

সর্বনাশ! রাজা প্রমাদ গুণলেন। একজন অসুস্থ হয়ে পড়লে কিছু করার নেই, যে কোন লোকের যে কোন সময়ে অসুখ হতে পারে।

কিন্তু, এখন উপায় ? গ্রীষ্মের দুপুর, চারদিকে রোদ্দুর খা খা করছে, এই গরমে এভাবে পথের মাঝে বসে থাকাও তো অসম্ভব। তার ওপর লোকটা কখন সুস্থ হবে, তারও ঠিক নেই—সব মিলিয়ে একটা অনিশ্চিত অবস্থা।

বাহকরাও চিন্তায় পড়েছিল। তারাও খোঁজ করছিল একটি লোকের। কিন্তু এই গরমে বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া কেউ পথে বেরোয় না—লোক পাওয়া যাবে কোথায় ?

হঠাৎ রাজার এক অনুচরের নজরে পড়ল, খানিক দূরে একটা বট-গাছের নিচে একটা লোক বসে আছে। জড়ভরত কে, তা তিনি জানতেন না। শুধু দেখলেন, লোকটার চেহারা বেশ শক্তসমর্থ—অলসভাবে বসে আছে গাছের নিচে, তার মানে লোকটার এখন কোন কাজ নেই।

অনুচর এগিয়ে গিয়ে তাকে ডাকলেন—এই হে, শুনছ !

জড়ভরত কোন কথা না বলে উদাসভাবে তাঁর দিকে একবার তাকালেন। সেই চাউনিতেই স্পষ্ট প্রকাশ পেয়ে গেল, লোকটা অপ্রকৃতিস্থ।

দেখে অনুচর মনে মনে খুশিই হলেন। লোকটা পাগল হলেই ভালো হয়, তাকে দিয়ে কাজটা করানো যাবে। সাধারণ লোক এই গরমে পালকি বইতে রাজি নাও হতে পারে।

অনুচর বললেন—আমাদের একজন লোক পালকি বইতে বইতে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। তুমি কি তার বদলে পালকি বইতে পারবে ?

জড়ভরত এবারও কোন উত্তর না দিয়ে শুধু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন।

এবার অনুচরের রাগ হয়ে গেল। লোকটার এত বড় স্পর্ধা, একটা কথারও উত্তর দিচ্ছে না ? তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে জড়ভরতের হাত ধরে এক টান দিয়ে টেনে তুলে বললেন—ওঠো, পালকি বইবে চল।

জড়ভরত আর কি করেন, অন্য বাহকদের সঙ্গে পালকিতে কাঁধ রাখলেন। পালকি এগিয়ে চলল।

কিন্তু জড়ভরতের তো এসব কাজ করার অভ্যাস ছিল না। তাই খানিকটা পথ গিয়েই তিনি খুব ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। অন্য তিন বাহকের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারছিলেন না। বারবার তাঁর কাঁধ থেকে পালকি সরে যেতে লাগল।

এভাবে পালকি বয়ে নেওয়া যায় না। অন্য বাহকরা তাই জড়ভরতের উপর ক্রুদ্ধ হয়ে উঠছিল। বার বার তারা তাঁকে খোঁচাচ্ছিল—কি গো, ওভাবে পিছিয়ে পড়ছ কেন?

বারকয়েক বাহকদের কথা শোনার পর পালকির ভেতরে রাজা সচকিত হয়ে উঠলেন। বললেন—কি হয়েছে গো?

বাহকরা পালকি থামিয়ে জড়ভরতকে দেখিয়ে বলল—এই লোকটার জন্য আমরা ঠিকভাবে পালকি বয়ে নিয়ে যেতে পারছি না। বারবার লোকটা পিছিয়ে পড়ছে।

রাজার একটু তাড়া ছিল। তার মাঝে আরও দেরি হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিতে তিনি আর মেজাজ ঠিক রাখতে পারলেন না। জড়ভরতের দিকে তাকিয়ে বললেন—কি রে মূর্খ, এদের কথা শুনছিস না কেন? চেহারাটা তো বেশ ভালোই বাগিয়েছিস, পালকি কাঁধে নিতে এত অস্বস্তি কেন?

জড়ভরত এতক্ষণ কোন কথাই বলেন নি। রাজার অনুচর তাকে জোর করে ধরে এনে তাঁর কাঁধে পালকি চাপিয়ে দিয়েছিল, তিনি বইতে শুরু করেছেন। আবার বাহকরা তাঁকে নানারকম গালমন্দ করলেও তিনি তাদের কিছুই বলেন নি। কিন্তু এখন রাজার মুখে অসম্মানজনক 'তুই' শব্দটা শুনে তিনি মনে মনে খুবই ক্ষুব্ধ হলেন। রাজাকে বললেন—আপনি কি আমাকে বলছেন রাজা?

রাজা ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললেন—হ্যাঁ, তোকে। তোকে ছাড়া আর কাকে বলব? ওরা তিনজন তো ঠিকই বইছে পালকি, কেবল তোর

জন্যই যেতে দেরি হচ্ছে। তুই কি ক্লান্ত? তাহলে একটু বিশ্রাম নিয়ে নে, তারপর চল জোর কদমে।

জড়ভরত আর থাকতে পারলেন না।

শান্তভাবে বললেন—হে রাজা, আপনি কাকে মূর্খ বলছেন, কাকে আপনি পালকিবাহক বলছেন? কে ক্লান্ত হয়েছে বলছেন? কাকে আপনি 'তুই' বলে সম্বোধন করছেন? হে রাজা, যদি আপনি 'তুই' শব্দটাকে মাংস-অস্থি-মজ্জা-রক্তসমন্বিত এই দেহের উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করে থাকেন, তবে দেখুন, আপনার দেহ যেমন পঞ্চভূতের উপাদানে তৈরি, আমার দেহটাও তেমনি। তাই আমি যেমন আপনাকে 'আপনি' বলে সম্বোধন করছি, আপনারও তাই করা উচিত। আবার দেখুন, এই দেহটা তো অচেতন, জড়—এর কি কোন ক্লান্তি বা কষ্ট থাকতে পারে? যদি আপনি আমার মনকে লক্ষ্য করে 'তুই' শব্দটা প্রয়োগ করে থাকেন, তাহলে আপনার মন যেমন নাগালহীন এবং সর্বব্যাপী, আমারও তো তাই। যদি দেহমনের অতীত কোন বস্তুকে লক্ষ্য করে 'তুই' শব্দটাকে প্রয়োগ করে থাকেন, তাহলে সেই বস্তু তো আত্মা। আত্মার তো কোন ভেদ নেই—আপনার আত্মা যেমন শুদ্ধ ও নির্মল, আমার আত্মাও তেমনি।

রাজা অবাক হয়ে জড়ভরতের কথা শুনছিলেন। উন্মাদপ্রায় একটা লোক যে এমন কথা বলতে পারে, তা তিনি চিন্তাই করতে পারেন নি।

জড়ভরত কিন্তু থামলেন না। তেমন ভাবেই বলতে লাগলেন—রাজা, আত্মা কি কখনও ক্লান্ত হতে পারে? না। রাজন্, আমি ক্লান্ত হই নি, আমার আত্মা ক্লান্ত হয় নি। শুধু আমার কেন, কারুর আত্মাই কখনও ক্লান্তি বা দুর্বলতা অনুভব করে না। কারণ আত্মা সর্বব্যাপী এবং সর্বশক্তিমান। আপনার পালকির বাহকরা কোন দিকে না তাকিয়েই পথ চলেছে, তাই তাদের পায়ের তলায় অসহায় কীট-পতঙ্গগুলি পদদলিত হচ্ছে। কিন্তু ঐ অসহায় জীবগুলির আত্মাকে

কষ্ট দেওয়ার কোন ইচ্ছে আমার ছিল না, তাই তারা যাতে পিষ্ট হয়ে মারা না যায় সেদিকে লক্ষ্য রেখে পথ চলছিলাম। নিচের দিকে সজাগ দৃষ্টি রেখে পালকি বইতে গিয়ে তাই বাহকদের সঙ্গে সমান তালে চলতে পারি নি। আমি কি রাজা কাজটা খারাপ করেছি?

রাজা কি বলবেন, ভেবে পেলেন না। বুঝলেন, যিনি বলছেন, তিনি সামান্য মানুষ নন, তিনি ব্রহ্মজ্ঞানী। আত্মার স্বরূপ তিনি দেখেছেন, তাই ক্ষুদ্র একটা জীবের আত্মাকেও কষ্ট দিতে নারাজ। এমন জ্ঞানীকে বাহক হিসেবে নিযুক্ত করে তিনি খুবই অন্যায় কাজ করেছেন।

কথাটা মনে হতেই পালকি থেকে বেরিয়ে এসে রাজা জড়ভরতের পায়ে লুটিয়ে পড়লেন। তাঁকে প্রণাম করে বললেন—হে জ্ঞানী, আপনি আমায় ক্ষমা করুন। আমি না জেনে আপনার আত্মাকে কষ্ট দিয়েছি, আপনাকে পালকি বইতে বলেছি। আপনি আমার জ্ঞানচক্ষু খুলে দিয়েছেন, তাই আপনাকে ধন্যবাদ।

জড়ভরত রাজাকে আশীর্বাদ করে নিজ গ্রামে ফিরে এলেন এবং আগের মতই নিরাসক্ত জীবন যাপন করতে লাগলেন।

যথাসময়ে জড়ভরতের মৃত্যু হল। পূর্ণ আত্মজ্ঞান হওয়ায় এবার কিন্তু তাঁর পুনরায় জন্ম হল না। তিনি চিরকালের মত জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়ে স্বর্গের বাসিন্দা হলেন।

হিংসায় মুক্তি নেই

[মানুষ একে অপরকে হিংসা করে, একের সৌভাগ্যে অন্যে জ্বলে পুড়ে মরে। কিন্তু হিংসায় মনের উন্নতি হয় না, পরিণামে অবনতিই ঘটে। গৌতম বুদ্ধেরও আগে যিনি বুদ্ধত্ব লাভ করেছিলেন, সেই মহাপুরুষ কাশ্যপের সমসাময়িক এক স্থবিরের জীবনের একটি ঘটনার উল্লেখ করে বিবেকানন্দ অনুগামীদের বুঝিয়ে দিলেন, হিংসার নাগপাশ থেকে মুক্ত হতে না পারলে প্রকৃত মানুষ হওয়া যায় না।]

গৌতম বুদ্ধ বুদ্ধত্ব বা জ্ঞান অর্জন করেছিলেন বলে তাঁর নাম হয়েছিল 'বুদ্ধ' বা জ্ঞানী। তাঁর আগে যিনি সম্যক জ্ঞান লাভ করেছিলেন তাঁর নাম কাশ্যপ।

কাশ্যপের সময়ে এক গ্রামে এক সচ্চরিত্র স্থবির বাস করতেন। স্থবিরের এক অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। তিনি যে কোন লোকের মুখ ও হাবভাব দেখে তার মনের ভাব বলতে পারতেন।

স্থবিরের এই অসাধারণ ক্ষমতার কথা লোকমুখে প্রচার হয়ে পড়ল। গ্রামের জমিদারের কানেও তা গেল। তিনি একদিন এসে স্বচক্ষে স্থবিরের ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করলেন। তারপর মুগ্ধ হয়ে তাঁর ভরণপোষণের ভার গ্রহণ করলেন। স্থবির তাতে বেশ সুখেই দিনযাপন করছিলেন।

একদিন ওই গ্রামে এলেন এক জ্ঞানী ব্যক্তি। ওই গ্রামে তিনি এর আগে কখনও আসেন নি। গ্রামটির সুন্দর পরিবেশ তাঁর পছন্দ হল। তিনি স্থির করলেন, কিছুকাল ওখানেই কাটাবেন।

দিনকয়েকের মধ্যেই গ্রামের জমিদারের সঙ্গেও তাঁর আলাপ হল। জমিদার তাঁর সৌম্য মূর্তি, চমৎকার চালচলন, বিনম্র কথাবার্তা এবং

এবং নিরহঙ্কার মনোভাব দেখে খুব খুশি হলেন। জ্ঞানীকে খুব খাতির করে তাঁকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেলেন, তাঁর কাছ থেকে ধর্মকথা শুনলেন।

জ্ঞানীর সুগভীর জ্ঞান এবং চমৎকার বোঝানোর ক্ষমতা জমিদারের অন্তর স্পর্শ করল। তিনি ধর্মালোচনার শেষে তাই জ্ঞানীকে বললেন—প্রভু, আমাদের এই গ্রামে এক স্থবির আছেন। তিনিও আপনার মতই জ্ঞানী এবং চমৎকার মানুষ। যাতে তিনি নির্ভাবনায় জ্ঞানচর্চা করতে পারনে, সেজন্য আমি এই গ্রামেই তাঁর জন্য একটি বিহার নির্মাণ করে দিয়েছি। আপনি যদি দয়া করে এই গ্রামে থাকার সময় সেই বিহারে থাকেন, তাহলে খুশি হব।

জ্ঞানী সঙ্গে সঙ্গেই রাজি হলেন।

জমিদার বললেন—তাহলে চলুন, আপনাকে ঐ বিহারে নিয়ে নিয়ে গিয়ে স্থবিরের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই।

জমিদারের অনুরোধ জ্ঞানী এলেন ঐ বিহারে। স্থবিরের সঙ্গে তার আলাপ হল। শিষ্টাচার বিনিময়ের পর জমিদার নিজের বাসনার কথা স্থবিরকে জানালেন। বিহার তো জমিদারের তৈরি করা, কাজেই তাঁর ইচ্ছাকে অমান্য করা যায় না। স্থবির জ্ঞানিকে দেখে মনে মনে খুশি না হলেও জমিদারের কথায় জ্ঞানীকে বিহারে থাকতে দিতে রাজি হলেন। একটি কক্ষে তাঁকে থাকতে দিলেন। জ্ঞানী সেই কক্ষে প্রবেশ করে ধ্যানমগ্ন হলেন।

পরদিন আবার জমিদার এলেন জ্ঞানীর কাছে। স্থবিরকে প্রণাম করে ঐ জ্ঞানীর কথা জিজ্ঞেস করলেন। স্থবির জ্ঞানীর কোন খোঁজই রাখেন নি এতক্ষণ। কিন্তু জমিদারকে এই সত্যি কথা বললে পাছে তিনি মনোক্ষুণ্ণ হন, এই ভেবে বললেন—উনি তো নিজের ঘরেই আছেন।

জ্ঞানীর কথাবার্তা জমিদারকে মুগ্ধ করেছিল। আবার তিনি ওঁর সঙ্গে দেখা করতে চাইছিলেন। তাই বললেন—তাহলে ওঁর কাছেও একবার যাক।

এই বলে জমিদার নিজেই গেলেন জ্ঞানীর কাছে।

ধ্যান শেষ করে জ্ঞানী তখন বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। জমিদারকে দেখে যথোচিত অভ্যর্থনা জানালেন। তারপর শুরু হল ধর্মালোচনা। কথায় কথায় অনেক রাত হয়ে গেল।

জমিদার কিন্তু খুব খুশি। তিনি বিহার ত্যাগের আগে স্থবির ও জ্ঞানী উভয়কেই পরদিন দুপুরে তাঁর বাড়িতে নিমন্ত্রণ করলেন।

জমিদার চলে গেলেন, কিন্তু তাঁর কথাগুলো স্থবিরের মোটেই পচ্ছন্দ হল না। কোথাকার কোন্ জ্ঞানী একদিনের মধ্যে দিব্যি জমিদারের নজর কেড়ে নিয়েছেন। এতদিন জমিদারের কাছে কেবল তাঁরই খাতির ছিল, এবার তাতে ভাগ বসাতে এসেছেন আর একজন।

হিংসায় পরিপূর্ণ হয়ে গেল স্থবিরের মন। না, এ জিনিস সহ্য করা যায় না। তাঁর একাধিপত্যে ভাগ বসাবেন জ্ঞানী—কিছুতেই তা হতে দেওয়া যায় না। যে কোন ভাবে হোক জ্ঞানীকে এখান থেকে তাড়ানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

এদিকে স্থবিরের এ রকম মনোভাব পরিবর্তনের কথা তো আর জ্ঞানী বুঝতে পারেন নি। জমিদার চলে যাবার পর তিনি তাই সৌজন্যবশত স্থবিরের কাছে গেলেন। স্থবির কিন্তু তার সঙ্গে কথাই বললেন না, তাঁকে এতটুকু আমল দিলেন না। জ্ঞানী এর থেকে স্থবিরের মনোভাব বুঝতে পারলেন। কিন্তু তা প্রকাশ করলেন না। নিজের ঘরে গিয়ে আবার ধ্যানমগ্ন হলেন।

স্থবির কিন্তু সারারাত ঘুমোতে পারলেন না। সারারাত কেবল চিন্তা করলেন কি করে জমিদারের কাছে তিনি একা যাবেন।

পরদিন খুব ভোরে উঠলেন স্থবির।

উঠেই জ্ঞানীর ঘরের সামনে গেলেন। ভদ্রলোক তখনও ঘুমোচ্ছেন। ঘরের দরজা বন্ধ। দেখে খুশি হলেন স্থবির। সারারাত ভেবে তিনি যে উপায় বের করেছেন, তা ফলবতী হবে খুব সহজে।

স্থবির একটা কাঁসর এনে জ্ঞানীর দরজার সামনে খুব আস্তে বাজালেন, তারপর খুব আস্তে জ্ঞানীর ঘরের দরজায় টোকা দিলেন।

ঘুমন্ত জ্ঞানী স্বভাবতই দুটো শব্দের একটাও শুনতে পেলেন না। ব্যস্ অজুহাত তৈরি হয়ে গেল। স্থবির এরপর একাই ভিক্ষাপত্র হাতে নিয়ে জমিদারের বাড়ি এলেন।

অত তাড়াতাড়ি স্থবিরকে একা আসতে দেখে জমিদার একটু অবাকই হলেন। বললেন—জ্ঞানী এলেন না?

জমিদার এমন প্রশ্ন করবেন, স্থবির তা জানতেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে বললেন—উনি এখনও ঘুমিয়ে আছেন। আমি কাঁসর বাজিয়ে, দরজায় আঘাত করেও তাঁকে জাগাতে পারি নি। বোধ হয় কাল অনেক রাতে ঘুমিয়েছেন বলেই আজ একটু বেশি সময় ঘুমোচ্ছেন।

জমিদার আর কি বলবেন, স্থবিরকে বিশ্রাম নিতে বললেন।

এদিকে জ্ঞানী ঘুম থেকে উঠে স্নান ও ধ্যান সেরে স্থবিরের খোঁজ করতে এলেন। শুনলেন, উনি একাই জমিদারের বাড়িতে চলে গেছেন। শুনে মনটা একটু খারাপ হয়ে গেল। একবার ভাবলেন, একাই খাবেন। পরক্ষণেই ভাবলেন এমন তো কোন জরুরী ব্যাপার নয়, স্থবির তো গিয়েছেন, কোন দরকারী কথা থাকলে স্থবিরই তা বলে দেবেন। এই ভেবে তিনি একাই অন্যত্র চলে গেলেন।

দুপুরে জমিদারের বাড়িতে তৃপ্তি সহকারে খেলেন স্থবির।

জমিদার আয়োজনে কোন ত্রুটি রাখেন নি। রীতিমত ভুরি-ভোজ যাকে বলে। বেগুন ভাজা থেকে শুরু করে মাছ-মাংস-পোলাও -পায়েস কিছুই বাদ নেই। স্থবিরের সামনে বসে খুব যত্ন করে জমিদার পেট ভর্তি করে তাঁকে খাওয়ালেন। কিন্তু তাতেও যেন তৃপ্তি হচ্ছিল না জমিদারের। বারবার কেবলই বলছিলেন—জ্ঞানী এলে খুব ভালো হতো, আপনাদের দুজনকে একসঙ্গে প্রাণ ভরে খাওয়াতাম।

জমিদারের মাথায় ঐ একটা কথাই ঘুরছিল। স্থবির যখন খাবার উদ্যোগ নিচ্ছেন তখনও তাই জ্ঞানীর কথা বলছিলেন তিনি। এত খাবার, কিন্তু কিছুই তো দেবার উপায় নেই। জমিদার স্থবিরের হাতে

এক বাটি পায়েস দিয়ে বললেন—আপনি যদি জ্ঞানীকে এই পায়েসটুকু খেতে দেন, তাহলে বড় খুশি হব।

স্থবির অনিচ্ছাসত্ত্বেও পায়েসের বাটিটা হাতে নিয়ে পথে বেরোলেন। যেতে যেতেও জ্ঞানী ওপর খুব হিংসে হচ্ছিল তাঁর। দু দিনের আলাপে জমিদার এত ভালবেসে ফেলেছেন তাঁকে ? লোকটা যদি এখন এই পায়েসের স্বাদ পায়, তাহলে মেরেও তাকে আর পড়ানো যাবে না শুধু জমিদারের বাড়িতে খাওয়ার লোভেই লোকটা থেকে যাবে এখানে।

তহলে এখন উপায় ?

পথ চলতে চলতে স্থবির উপায়ের কথাই ভাবছিলেন।

তিনি কি জলে ফেলে দেবেন পায়েসের বাটিটা ? তাহলে তো খানিক পরেই বাটিটা ভেসে উঠবে, তিনি ধরা পড়ে যাবেন। মাটিতে ফেলে দিয়ে যাবেন ? তাতেও তো ধরা পড়ার ভয়। রাজ্যের কাক এসে জড়ো হবে সেখানে, তখন সবাই ব্যাপারটা জেনে ফেলবে। জমিদার যদি জানতে পারেন পায়েসটা জ্ঞানীকে না দিয়ে তিনি ফেলে দিয়েছেন, তাহলে ক্রুদ্ধ হবেন তিনি।

এই রকম সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে স্থবির পথ চলছিলেন।

হঠাৎ তাঁর নজরে পড়ল একটা পোড়া ক্ষেত। বাঃ, চমৎকার জায়গা তো ! এখানেই ফেলে দেওয়া যাক পায়েসের বাটিটাকে, তারপর তার ওপর পোড়া ময়লা চাপা দিয়ে দিলেই কেউ কিছু বুঝতে পারবে না।

স্থবির তাই করলেন। ফিরে এলেন বিহারে শূন্যহাতে।

নিখুঁতভারে সাজিয়েছেন পুরো ব্যাপারটাকে। তিনি প্রকাশ না করলে কেউ কিছু ধরতে পারবে না।

তবু কেমন যেন একটা পাপবোধ ক্রিয়া করতে লাগল। বিবেকের অনুভব করতে লাগলেন একা একাই। কাজটা তিনি ভালো করেন নি। জ্ঞানী তো তাঁর সঙ্গে কোন খারাপ আচরণ করেন নি। এক-

বারের জন্যও হিংসে করেন নি, শত্রুতা করেন নি। তাহলে তিনি কেন অহেতুক জমিদারের দেওয়া পায়েসটুকু ফেলে দিলেন?

না, এ কাজ করা তাঁর উচিত হয় নি। এখুনি জ্ঞানীর কাছে গিয়ে সব ঘটনা বলে তাঁর কাছে ক্ষমা চেয়ে নেবেন, তাহলে আর এভাবে তাঁকে বিবেক যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে না।

জ্ঞানীর ঘরের কাছে এলেন তিনি।

কিন্তু এ কি? দরজা যে খোলা। কোথায় গেলেন ভদ্রলোক?

বিহারের একজন জানাল, তিনি বিহার ছেড়ে চলে গেছেন।

কথাটা শুনেই উপহাস করে মেঝেতে বসে পড়লো স্থবির। লোকটা চলে গেল? দুদিন যাকে নিয়ে বৃথা তিনি হিংসার জালে জড়িয়ে ছিলেন, জমিদারের কাছ থেকে তাকে আড়াল রাখার জন্য কত না চেষ্টা করেছেন, এমন কি একটু আগে জমিদারের দেওয়া পায়েসটুকুও হিংসার বশবর্তী হয়ে ফেলে দিয়ে এলেন, তিনি তো সহজে তাঁকে নিষ্কৃতি দিয়ে গেলেন।

স্থবিরের মন অনুতাপে আর বিবেকদংশনে জর্জরিত হতে লাগল। এত নীচ আমি? নিজের আধিপত্য রাখতে এত নিচে নেমে গেলাম?

সব কাজগুলোই তো নিজের খাওয়া-পরার স্বাচ্ছন্দ্য যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে সেইজন্য। শুধু পেটের জন্য, নশ্বর এই শরীরটার খনিক আরামের জন্য।

স্থবির ঠিক করলেন, আজ থেকে তিনি খাওয়া বন্ধ করবেন। যে পেটের চিন্তায় তাঁর মনে হিংসার উদ্রেক ঘটেছিল, সেই পেটকে তিনি আর খাদ্যই দেবেন না। হিংসা তাঁর মনের শুচিতা নষ্ট করে দিয়েছে, একে বিনাশ করতেই হবে।

শেষ পর্যন্ত অনাহারেই মৃত্যু বরণ করলেন স্থবির।

প্রকৃত শিক্ষা

[শিক্ষা তথা জ্ঞান একটা আলাদা জিনিস। তাকে খুব কম লোকই আয়ত্ত করতে পারে। কিন্তু সাধারণ মানুষ নিজেদের অজ্ঞানতার কথা স্বীকার করতে চায় না। মূর্খ ব্যক্তি এমন ভান করে যেন সে কত কিছু জানে। অনুরাগীদের কাছে এদের নিয়ে একটি শিক্ষণীয় গল্প বললেন বিবেকানন্দ]

এক গ্রামে বাস করত এক পণ্ডিত-মূর্খ। সে লেখাপড়া জানত খুব কম, কিন্তু লোকজনের সামনে এমন ভাব দেখাত যেন সে কত জানে, তার কত জ্ঞান।

সাধারণ লোক তো কোন কিছুরই ভেতর দেখে না, দেখে কেবল বাইরেটা। তাই ঐ মূর্খ পণ্ডিতকে তারা খুব জ্ঞানী বলে ভাবত।

পণ্ডিত যখন দেখল, লোকে তার জ্ঞানের স্বল্পতা বুঝতে পারে নি। তখন সে ঠিক করল, জ্ঞানের এই ভড়ং দেখিয়ে পয়সা রোজগার করবে।

একটা টোল খুলে বসল সে।

তাকে নিয়ে বেশ কিছু প্রচার তো আগেই হয়েছিল, এবার টোল খুলতে প্রচার হল আরও বেশি। যিনি টোল খুলে অন্য লোককে পড়ানোর কথা চিন্তা করতে পারেন, সত্যিই তিনি জ্ঞানী। অতএব সবাই নিজের ছেলেকে তার কাছে পড়াতে পাঠাতে চাইল। পণ্ডিতের পসার জমল খুব।

লোকে যাতে ক্ষণেকের জন্যও তার বিদ্যামাত্রা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ না করে সেজন্য পণ্ডিত অনেক ভালো ভালো বই কিনে এনে নিজের ঘরে সাজিয়ে রেখেছিল। এসব বইয়ের এক লাইনও সে কোন দিন পড়ে নি, কিন্তু টোলে বসে সে এমন ভাবে বইগুলোর দিকে তাকাত বা নাম উল্লেখ করত যে লোকে ভাবত ওসব বইগুলো পড়েছে সে।

এসব লোক—দেখানো কাজের ফল ফলল অচিরেই। দলে দলে ছাত্র আসতে লাগল তার কাছে। এক মুহূর্ত বিশ্রাম নেবার উপায় নেই পণ্ডিতের, তবু ছাত্র আসার শেষ নেই। কত ছেলে ভর্তি হতে না পেরে নিরাশ হযে ফিরে গেল।

মূর্খ পণ্ডিতের এভাবে শ্রীবৃদ্ধি হতে থাকে দিনের পর দিন।

এমন একটা সময়ে রামানন্দ নামে একটি মেধাবী ছাত্র পণ্ডিতের কাছে পড়তে এল। ছেলেটির স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত প্রখর। যে কোন নিয়ম একবার পড়লে বা শুনলে তার তা চিরতরে মনে থাকত। এমন মেধাসম্পন্ন ছাত্র পণ্ডিতের কাছে এর আগে কখনও আসে নি

পণ্ডিত প্রথমে রামানন্দকে চিনতে পারে নি। চিনল কিছুদিনের মধ্যেই।

টোলে পণ্ডিত পড়াত মাত্র চার—পাঁচটা বই। ওই কটা বই পড়তে সে ইচ্ছে করেই লাগাত সাত—আট বছর সময়। এখানেও ব্যবসা। যত বেশি সময় ছাত্র টোলে পড়বে, তত টাকা আয়। পণ্ডিত ইচ্ছে করেই তাই ধীরগতিতে বইগুলো পড়াতে।

অসাধারণ মেধাবী রামানন্দের ক্ষেত্রে হল অন্য ব্যাপার। সে মাত্র দু মাসের মধ্যে ওই চার পাঁচটা বই পড়ে ফেলল। বিদ্যা বা জ্ঞানের শেষ নেই। কত জানার জিনিস আছে পৃথিবীতে। একটা জিনিস জানা শেষ হলেই আর একটা জিনিস তাই জানার ইচ্ছা হয়।

রামানন্দের ছিল এই রকমা অনুসন্ধিৎসা। সে তাই পণ্ডিতের নির্দিষ্ট বই শেষ করেই ঘরে সাজিয়ে রাখা বইগুলো পড়তে চায়। পণ্ডিতকে বার বার অনুরোধ করে ওই বইগুলো বুঝিয়ে দিতে।

পণ্ডিত এবার সত্যিই মুসকিলে পড়ল।

পণ্ডিত প্রথমে রামানন্দকে চিনতে পারে নি। চিনল কিছুদিনের মধ্যেই।

টোলে পণ্ডিত পড়াত মাত্র চার-পাঁচটা বই। ঐ কটা বই পড়াতে সে ইচ্ছে করেই লাগাত সাত-আঠ বছর সময়। এখানেও ব্যবসা।

যত বেশি সময় ছাত্র টোলে পড়বে, তত টাকা আয়। পণ্ডিত ইচ্ছে করেই সেই ধারাগতিতে বইগুলো পড়াত।

অসাধারণ মেধাবী রামানন্দের ক্ষেত্রে হল অন্য ব্যাপার। সে মাত্র ছ মাসের মধ্যে ঐ চার-পাঁচটা বই পড়ে ফেলল। বিদ্যা বা জ্ঞানের শেষ নেই। কত জানার জিনিস আছে পৃথিবীতে। একটা জিনিস জানা শেষ হলেই আর একটা জিনিস তাই জানার ইচ্ছা হয়।

রামানন্দের ছিল এই রকম অনুসন্ধিৎসা। সে তাই পণ্ডিতের নির্দিষ্ট বই শেষ করেই ঘরে সাজিয়ে রাখা বইগুলো পড়তে চায়। পণ্ডিতকে বার বার অনুরোধ করে ঐ বইগুলো বুঝিয়ে দিত।

পণ্ডিত এবার সত্যিই মুশকিলে পড়ল।

ছাত্রের কাছে বলা যায় না, ঐ বইগুলোর এক বর্ণও জানা নেই। এদিকে রামানন্দ ক্রমাগত তাগাদা দিয়ে চলেছে। ছেলেটাকে নিয়ে সত্যিই মুসকিল হয়েছে। একবার যা শোনে, তাই মুখস্থ হয়ে যায় তার। এসব বই পড়লেই সব কিছু মুখস্থ করে নিয়ে পণ্ডিতের চেয়ে জ্ঞানী হয়ে উঠবে। আবার যা বুঝবে না, সে বিষয়ে যদি প্রশ্ন করে তাহলে পণ্ডিতের অজ্ঞানতা প্রকাশ হয়ে পড়বে।

পণ্ডিত তাই নানা অজুহাতে রামানন্দকে এড়িয়ে যায়। কিছুতেই ঐ সাজানো বইগুলো ওর হাতে দেয় না।

রামানন্দ মন খারাপ করে টোলে বসে থাকে।

দেখে পণ্ডিতেরও একটু খারাপ লাগে। কিন্তু উপায় নেই। রামানন্দ একেবারে পণ্ডিতের গুরুগিরিতেই টান বাধিয়েছে, তাকে এগিয়ে যেতে দিলে তো টোলই উঠে যাবে।

পণ্ডিত ভেবে পায় না, রামানন্দ কি করে এমন প্রচণ্ড মেধার অধিকারী হল। নিশ্চয়ই এর পেছনে কোন রহস্য আছে। ঐ রকম একটা কিছু না থাকলে কিছুতেই এত দ্রুত কিছু শেখা যায় না, এখন বিশ্বাস তার মনে বদ্ধমূল হল।

একদিন পণ্ডিত তার অনুগত কয়েকজন ছাত্রকে ডেকে আড়ালে বলল—তোরা একটা কাজ করতে পারবি?

—কি ? ছাত্ররা সমস্বরে জিজ্ঞাসা করল।

পণ্ডিত বলল—তোরা রামানন্দের একটু নজর রাখ তো দেখি। ও কোথায় যায়, কি করে, এসব লক্ষ্য করে আমাকে জানাবি।

ছেলেরা গুরুর কথায় সায় দিয়ে গোপনে রামানন্দের উপরে নজর রাখতে শুরু করল। রামানন্দ যেখানে যায় গোপনে ওরা তাকে অনুসরণ করে।

দিন কয়েক পরে ছাত্ররা দেখল, দুপুরে টোল ছুটি হবার পর রামানন্দ একটা পুকুরের কাছে চলে এল। পুকুরের পাড়ে একটা আমগাছের নিচে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ পড়া মুখস্থ করল। তারপর গাছের তলায় বসে গোটাকয়েক রুটি খেয়ে পুকুরে স্নান করতে নামল।

ছাত্ররা দূর থেকে প্রচণ্ড কৌতূহল নিয়ে পুরো ব্যাপারটাই দেখল। তারপর পণ্ডিতের কাছে গিয়ে বলল—পণ্ডিত মশাই, রামানন্দ গাছের নিচে দাঁড়িয়ে বিড় বিড় করে মন্ত্র পড়ছে, আর কি যেন চিবিয়ে চিবিয়ে খাচ্ছে।

মূর্খ পণ্ডিত ভাবল, ছাত্ররা ঠিকই বলছে। মন্ত্রের সাহায্য ছাড়া রামানন্দের পক্ষে অত মেধাবী হওয়া সম্ভব নয়। এবার ওর কাছ থেকে বিদ্বান হওয়ার রহস্যটা জেনে নিতে হবে।

স্নান সেরে রামানন্দ আবার টোলে ফিরে আসতেই পণ্ডিত তাকে ডেকে নিয়ে গেল অন্য একটা ঘরে। তারপর কোন ভূমিকা না করে সরাসরি বলল—তোমার এমন স্মৃতিশক্তি ও মেধার রহস্য আমি জানতে পেরেছি। তুমি নিশ্চয়ই মন্ত্র জানো, আর তোমার কাছে কোন দৈব ওষুধ আছে। এই দুয়ের জোরেই তোমাকে আমি যা শিখাই তুমি তার চেয়েও অনেক বেশি শিখে নিতে পেরেছ। এখন যদি তুমি আমাকে ঐ মন্ত্রটা শিখিয়ে দাও আর ঐ দৈব ওষুধটা খেতে দাও, তাহলে আমি আমার ছাত্রদের অনেক বেশি বিদ্যা দান করতে পারি।

রামানন্দ তো শুনে থ—বলছেন কি গুরু? সে সবিনয়ে হাত জোড় করে জানাল—গুরুমশাই, আমি মন্ত্রতন্ত্র কিছুই জানি না, আমার কাছে কোন ওষুধও নেই।

পণ্ডিত এখন সে কথা শুনলে তো! ছাত্ররা নিজ চোখে দেখে এসে সব কথা জানিয়েছে, তারা মিথ্যে বলে নি। মিথ্যে বলছে নিশ্চয়ই রামানন্দ, সে প্রকৃত সত্যকে গোপন রাখতে চাইছে।

একটু রাগতভাবেই পণ্ডিত তাই বলল—রামানন্দ, আমার কাছে মিথ্যে বলো না। গুরুর কাছে মিথ্যে বললে তোমার সর্বনাশ হবে, জিভ খসে পড়বে। তুমি পুকুর পাড়ের আমগাছটার নিচে দাঁড়িয়ে মন্ত্র পড় না? তারপর গাছের তলায় বসে কি যেন চিবিয়ে চিবিয়ে খাও না? মিথ্যে বলো না রামানন্দ, আমি তাহলে ভীষণ শাস্তি দেব তোমায়।

বুদ্ধিমান রামানন্দ এবার বুঝে নিল, সে দুপুরে টোল থেকে বেরোবার পর দূর থেকে কেউ তাকে অনুসরণ করেছে। সে কি করে, তা দেখতে পায় নি, পণ্ডিতমশাইকে এসে উলটোপালটা বুঝিয়েছে।

পণ্ডিতমশাইয়ের বিদ্যার দৌড় রামানন্দ আগেই টের পেয়ে গিয়েছিল। এবার বুঝল, পণ্ডিতকে সে যতখানি মূর্খ বলে ভাবত, পণ্ডিত আসলে তার চেয়েও বেশী মূর্খ। মূর্খকে বুঝিয়ে লাভ নেই, সে যা একবার বুঝেছে তার থেকে এক চুলও সরবে না। তার চেয়ে অন্য ব্যবস্থা নেওয়াই ভালো।

এই ভেবে রামানন্দ পণ্ডিতকে বলল—পণ্ডিতমশাই, আপনি তো তাহলে আমার সব ব্যাপারই জেনে নিয়েছেন। এখন তাই আর লুকোবার চেষ্টা না করে সত্যি কথা বলাই ভালো। স্বীকার করছি, আমি মন্ত্র জানি। কিন্তু ঐ মন্ত্র সরাসরি কাউকে বলে দিলে মন্ত্রদাতার অভিশাপে আমি এখুনি মরে যাব।

সর্বনাশ ! ছেলেটা বলে কি ! পণ্ডিত তো শুনে রীতিমত হতাশ হয়ে পড়লেন—তাহলে উপায় ?

রামানন্দ গম্ভীরভাবে বলল—উপায় যে একেবারে নেই তা নয়। গুরুজী সরাসরি ঐ মন্ত্র কাউকে শেখাতে নিষেধ করেছিলেন বটে, কিন্তু উনি বলে গিয়েছিলেন, ঐ মন্ত্র পড়ে লেখাপড়ার বড়ি তৈরি করে যদি কাউকে খেতে দিই, তাহলে সে দারুণ মেধাসম্পন্ন হবে।

পণ্ডিত যেন ক্রমশ আশার আলো দেখতে পাচ্ছেন ; বললেন—আছে নাকি তোমার কাছে ঐ বড়ি ?

রামানন্দ বলল—না পণ্ডিতমশাই, আমার কাছে যতগুলো বড়ি ছিল লোককে দিতে দিতে তা শেষ হয়ে গেছে। এখন আপনাকে দিতে হলে নতুন করে বড়ি তৈরি করতে হবে।

পণ্ডিত বলল—তাহলে তাই কর।

রামানন্দ গোমড়ামুখে বলল—কিন্তু পণ্ডিতমশাই, বড়িগুলো তৈরি করার ঝামেলা যে অনেক।

—যেমন ? পণ্ডিত জিজ্ঞেস করল।

বড়িগুলো তৈরি করতে কম করে এক সপ্তাহ সময় লাগবে। লাগবে চার ভরি সোনা।

—সোনা ? সোনা দিয়ে কি করবে ?

ঐ সোনা দিয়েই তো তৈরি হবে। টানা চার দিন আগুনে পোড়াতে হবে সোনাটুকুকে। তার সঙ্গে যেসব বই আমি পড়তে চাই সে গুলোকেও আগুনে পোড়াতে হবে। তারপর ঐ সোনা আর বইয়ের ছাই দিয়ে মন্ত্র পড়তে পড়তে বড়ি তৈরি হয়। বড়ি খেলে আর দেখতে হবে না, গোটা বইটাই মগজে আটকে থাকবে তখন।

মূর্খ পণ্ডিত অবাক হয়ে শুনছিল রামানন্দের কথা। একটা গোটা বইকে মনে রাখার যে এত সহজ পদ্ধতি আছে, তা ভাবতেই পারে

নি সে। ঘরে যে বইগুলো শুধু সাজিয়ে রাখা আছে সেগুলোকে তাহলে এভাবে বুঝে ফেলা যায়।

পণ্ডিত বলল—চার ভরি সোনা চাও তুমি? এ আর এমন কি, এখুনি দিয়ে দিচ্ছি আমি। আর বই? আমার বাড়িতে অনেক বই সাজিয়ে রাখা আছে। যত চাও নিতে পার। অল্প বড়িতে কিন্তু আমার হবে না, যথাসম্ভব বেশি বড়ি তৈরি করবে।

শুনে রামানন্দ মনে মনে হাসল। এটাই তো চাইছিল সে। মূর্খ পণ্ডিত বইগুলোকে সাজিয়ে রেখে পণ্ডিত সেজেছে, এগুলোকে এবার পুড়িয়ে দিলেই আর নিজেকে ওভাবে জাহির করতে পারবে না।

রামানন্দ পণ্ডিতের কাছ থেকে চার ভরি সোনা আর সব বই নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। তার সঙ্গে পণ্ডিত ও অন্য ছাত্ররা।

একটা বাড়ি ঠিক করে রেখেছিল রামানন্দ। সেখানেই বড়ি তৈরির আয়োজন হয়েছিল।

এক সময়ে রামানন্দ আগুন জ্বালল। ঐ চার ভরি সোনা ফেলে দিল আগুনের এক কোণে। একটা গোটা বই ফেলে দিল আগুনে। পণ্ডিত ও তার ছাত্ররা অবাক হয়ে রামানন্দের কাণ্ড-কারখানা দেখতে লাগল।

একটার পরএকটা বই রামানন্দ ফেলে দিচ্ছিল আগুনে। পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছিল ওগুলো। পণ্ডিতের সেজন্য কোন দুঃখ হচ্ছিল না। রামানন্দ বলেছে, যে বই পুড়বে সে বইয়ের সবটাই মগজে ঢুকে যাবে।

শুধু একটাই মুসকিল। চার দিন চার রাত ধরে চলবে সোনা গালানো আর বই পোড়ানো। এত বই পাওয়া যাবে কোথায়? তার কাছে যত বই ছিল পণ্ডিত তো সবই নিয়ে এসেছে। এরপর কি হবে?

রামানন্দ এদিকে বইগুলোকে আগুনে ফেলতে ফেলতে হ্রীং ব্রীং

করে নানা ধরনের উদ্ভট মন্ত্র পড়ছিল। মাঝে মাঝে পণ্ডিতের দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বলছিল—চমৎকার পুজো হচ্ছে পণ্ডিতমশাই। এমন সুন্দর বড়ি তৈরি হবে দেখবেন। কিন্তু আরও যে বই দরকার। চার দিন ধরে পুড়িয়ে যেতে হবে তো।

পণ্ডিতের উৎসাহ আস্তে আস্তে নিভে আসছিল।

গোটা ঘর ধোঁয়ায় ধোঁয়াময়। থাকা যাচ্ছে না ঘরে, চোখ জ্বালা করছে। পণ্ডিতের ছাত্ররা তো ঐ পরিবেশ সহ্য করতে না পেরে পণ্ডিতকে না বলেই চুপি চুপি সরে পড়ছিল।

পণ্ডিতও আর সইতে পারছিল না। রামানন্দকে জিজ্ঞেস করল—আর কত সময় লাগবে গো ?

রামানন্দ সহজ ভাবে বলল—এখনই কি পণ্ডিতমশাই ? সবে তো শুরু হল। চার দিন চার রাত ধরে চলবে এই পোড়ানোর কাজ, তারপর বড়ি তৈরি হবে।

পণ্ডিত কাতরভাবে বলল—উঃ আগুনের কি তাত গো! বসতে পারছি না যে।

এবার রামানন্দ হেসে ফেলল। আয়োজনে কাজ হয়েছে, এখন পণ্ডিত নিজেই পালাতে পারলে বাঁচে। বলল—আপনার বসে থাকার দরকার নেই পণ্ডিতমশাই। যতই কষ্ট হোক, বড়ি বানাতে হলে আমাকে এখানে চার দিন চার রাত থাকতেই হবে। আমি সব কাজ সেরে বড়ি তৈরি করে আপনাকে গিয়ে দিয়ে আসব।

পণ্ডিত তখন উঠতে পারলে বাঁচে। তাই কর রামানন্দ। আমি এখন উঠি, তুমি বরং বড়িগুলো তৈরি করে আমার টোলে দিয়ে এসো।

রামানন্দ মাথা নাড়ল।

পণ্ডিত চলে যাবার পর একটু সময় অপেক্ষা করে সে আগুন

নিভিয়ে ফেলল, তারপর আগুনের এক কোণে রাখা সোনাটুকু তুলে নিল।

তখন প্রায় মধ্যরাত্রি চারদিক নিস্তব্ধ কেউ জেগে নেই। পণ্ডিতের মূল্যবান বইগুলোকে ইচ্ছে করেই সে আগুনে দেয়নি, কারণ সে জানত তত ধৈর্য পণ্ডিতের নেই—ফাঁকিবাজরা ফাঁকতালে বিনা আয়াসে বিদ্যা লাভ করতে চায়। তাই তাদের পক্ষে কোনদিন জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হয় না।

রামানন্দ বইগুলো তুলে নিল। তারপর প্রকৃত বিদ্যার্জনের আশায় অন্য পথে যাত্রা শুরু করল।